করে দেখ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

করে দেখ

করে দেখ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আশা প্রকাশনী

প্রথম 'আশা' সংস্করণ
মহালয়া, ১৩৮৪.

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯.

মুদ্রাকর
শতদল গোস্বামী
নবগ্রন্থনা
৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা- ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

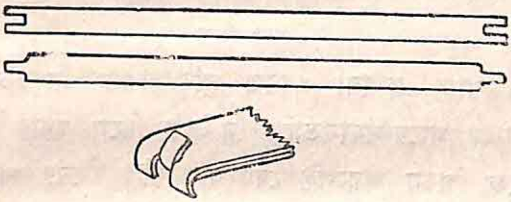
মূল্য পাঁচ টাকা

পরমা ও পৌলভীকে

সূচীপত্র

ফায়ার-অ্যালার্ম তৈরীর সহজ ব্যবস্থা

রাত্রিবেলায় যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন কোন কারণে আগুন লাগলে বেশ ছড়িয়ে পড়বার আগে টের পাওয়া যায় না। তাছাড়া এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে দিনেই হোক, কি রাতেই হোক—আগুন ছড়িয়ে পড়বার আগে কারুর নজরে পড়বার সম্ভাবনা কম। আগুন লাগবার সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া



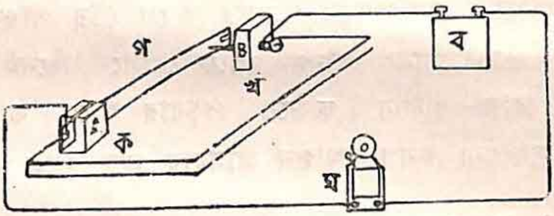
১নং চিত্র

গেলে অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর বিপদ এড়ানো সম্ভব হতে পারে। আগুন লাগবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়ার জন্যে তোমরা হয়তো ফায়ার-অ্যালার্মের ব্যবস্থার কথা শুনে থাকবে। ইচ্ছা করলে তোমরাও নিজের হাতে খুব সহজ উপায়ে এই রকমের ফায়ার-অ্যালার্ম তৈরী করে নিতে পারো। কি ভাবে তৈরী করতে হবে, সে কথা বলছি।

ফায়ার-অ্যালার্ম তৈরী করতে হলে দামী জিনিসের মধ্যে চাই কেবল একটা ইলেকট্রিক কলিং বেল, আর একটা ড্রাই ব্যাটারী। অন্য জিনিসের মধ্যে খানিকটা পিতল এবং টিনের পাত, কিছু ইলেকট্রিক তার, এক ফুট লম্বা তিন ইঞ্চি চওড়া একখানা কাঠ,

দেশলাইয়ের বাক্সের মাপের দু-টুকরো চৌকো কাঠ আর লম্বা একটা পিতলের স্ক্রু দরকার।

আট ইঞ্চি লম্বা, আধ ইঞ্চি চওড়া করে পিতলের পাত থেকে একটা ফালি কেটে নাও। ঠিক ওই মাপের টিনের পাত থেকেও একটা ফালি কেটে নিতে হবে। এক নম্বরের ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে, পিতল ও টিনের ফালি দু'খানার উভয় প্রান্তে সে রকম খাঁজ কেটে নিয়ে ১নং ছবির নীচের চিত্রের মত



২নং চিত্র

ভাঁজ করে পাত দুখানা একত্রে জুড়ে দাও। রিভেট করে পাত দু'খানা গায়ে গায়ে সমানভাবে মিলিয়ে দিলে ভাল হয়। এবার পাতখানাকে গরম করলেই দেখবে, সেটা টিনের পাত যেদিকে আছে সেদিকে ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে। কারণ তাপ প্রয়োগে পিতল লোহার চেয়ে বেশী প্রসারিত হয়।

এবার লম্বা কাঠখানার উপরে কাঠের টুকরো দু'খানা তলা থেকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে বসাতে হবে। দু-নম্বরের ছবিখানা ভাল করে লক্ষ্য কর। ক ও খ-চিহ্নিত কাঠের চৌকো টুকরো দুটি কিভাবে বসানো হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারবে। ক-টুকরোটাকে একটু পাশ ঘেঁষে, আর খ-টুকরোটাকে একটু ভিতরের দিকে বসাতে হবে। ক-টুকরোটাকে উপর থেকে প্রায় নীচু অবধি সরু করাত দিয়ে চিরে দাও। ছবির মত করে পিতলের লম্বা স্ক্রুটা, খ-টুকরোটার গায়ে এমন ভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় ঢুকিয়ে দিতে হবে যেন স্ক্রুটা কাঠখানার দুদিকেই বেশ খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে।

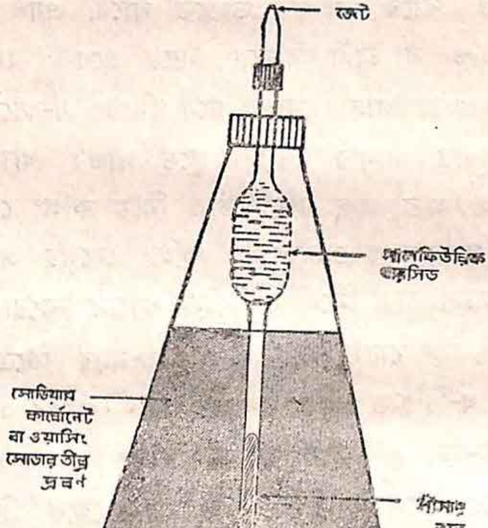
এবার গ-চিহ্নিত টিন ও পিতলের জোড়া পাতখানির এক প্রান্ত ক-কাঠখানার চেরার মধ্যে এমনভাবে চেপে বসিয়ে দাও যেন তার অপর প্রান্ত পিতলের স্ক্রুটার খুব কাছাকাছি থাকে, কিন্তু গায়ে ঠেকে না যায়। অবশ্য পিতলের স্ক্রুটা ডাইেন-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফাঁক কম-বেশী করা যাবে। বসাবার সময় গ-চিহ্নিত পাতের টিনের দিকটা যেন ভিতরের দিকে, অর্থাৎ স্ক্রুটার কাছে থাকে।

যেখানে আগুন লাগবার আশঙ্কা আছে সেখানে কোন স্থবিধা মত জায়গায় এই কাঠখানাকে বসিয়ে দাও। কলিং বেলের শব্দ কানে যেতে পারে বা ঘুম ভাঙতে পারে, এমন কোন স্থানে কলিং বেল ও ব্যাটারী বসিয়ে দিতে হবে। ব্যাটারীর এক প্রান্ত থেকে এক গাছা তার টেনে নিয়ে খ-কাঠের টুকরোর পিতলের স্ক্রুটার মাথার দিকে জুড়ে দাও। ব্যাটারীর অপর প্রান্ত থেকে আর এক গাছা তার নিয়ে কলিং বেলের একটা স্ক্রুর সঙ্গে সংযোগ করতে হবে। কলিং বেলের অপর স্ক্রু থেকে আর এক গাছা তার নিয়ে ক-চিহ্নিত কাঠের টুকরোয় আটকানো পাতের প্রান্তভাগ যোগ করে দাও। দু-নম্বর চিত্রের ব-চিহ্নিত ব্যাটারী ও ঘ-চিহ্নিত কলিং বেলের সঙ্গে তারের সংযোগ লক্ষ্য করলেই ব্যবস্থাটা অনায়াসে বুঝতে পারবে। ঘরে আগুন লাগলে উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে গ-চিহ্নিত পাতখানা বেঁকে গিয়ে পিতলের স্ক্রুর সঙ্গে লেগে যাওয়া মাত্রই কলিং বেল বেজে উঠবে।

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

বাতাস না পেলে আগুন জ্বলে না এবং জ্বলন্ত আগুন থেকে বাতাসের সংস্পর্শ বিচ্ছিন্ন করলে আগুন নিভে যায়—একথা তোমরা সবাই জান।

ছোটখাটো অগ্নিকুণ্ড বা অগ্নিশিখার উপর ঢাকনা চাপা দিয়ে বায়ুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আগুন নেবানো যায় বটে, কিন্তু বিস্তৃত আগুন আয়ত্তে আনা যায় না। সে সব ক্ষেত্রে ভেজা বালি ছড়িয়ে বাতাসের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করে আগুন নেবানো হয়, অথবা আগুনের উপর বেকিং পাউডার (বেশীর ভাগ বাইকার্বোনেট অব সোডা, অর্থাৎ খাবার সোডা) ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গরম হওয়ার ফলে বেকিং পাউডার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়ে আগুন নিবিয়ে দেয়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই বেকিং



আগুন-নেবানো যন্ত্র

পাউডার ছড়িয়ে আগুন নেবানো সম্ভব নয়, তবে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ব্যবস্থা থাকলে যথাসময়ে আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব। কিভাবে এই ব্যবস্থা করা যায় তার একটা সহজ উপায়ের কথা বলছি। চেষ্টা করলে তোমরা অনায়াসে এই রকমের একটা যন্ত্র তৈরী করে হাতের কাছে রাখতে পার।

ধাতুর পাত দিয়ে ফ্লাস্কের মত সরু মুখওয়ালা মাঝারি গোছের একটা পাত্র তৈরী করে নাও। পাত্রটার ভিতরের দিকে পিচের আস্তরণ দেওয়া থাকবে। পাত্রটা যতখানি খাড়াই প্রায় ততখানি লম্বা একটা কাচের নল সংগ্রহ কর। গ্লাস-ব্লোয়ারের সাহায্য নিয়ে কাচের নলটার এক মুখ বন্ধ করে তার মধ্যে একটা সীসার ভার পুরে দিতে হবে। তারপর নলটাকে মাঝামাঝি বেশ পাতলা করে ফুলিয়ে নীচের মুখ বন্ধ করে সালফিউরিক অ্যাসিড ভর্তি কর। নলের উপরের খোলা মুখটাকে ড্রপারের মত সূচালো করে দাও।

এবার পাত্রটার গলার প্রায় কাছাকাছি সাধারণ কাপড়-কাচা সোডার তীব্র দ্রবণ ভর্তি করে কাচের নলটাকে ছিপির সাহায্যে তার মধ্যে বসিয়ে দাও। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, কিভাবে যন্ত্রটা তৈরী করতে হবে তা সহজেই বুঝতে পারবে।

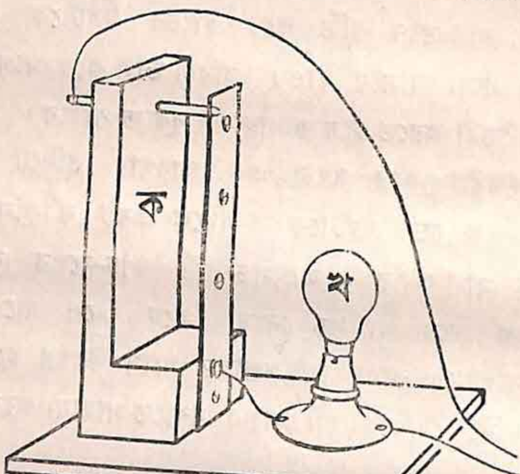
এভাবে তৈরী করে যন্ত্রটা এক জায়গায় বসিয়ে রাখ। প্রয়োজন উপস্থিত হলে যন্ত্রটাকে একদিকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কাৎ করলেই সালফিউরিক অ্যাসিড-ভর্তি কাচ-নলের ফুলানো জায়গাটা ভেঙ্গে গিয়ে অ্যাসিড সোডার সঙ্গে মিশে যাবে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং নলের সরু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে আগুন নেবাতে সাহায্য করবে।

নমুনা থার্মোস্ট্যাট তৈরীর কৌশল

ইনকিউবেটর বা ওই রকমের অন্য কোন আবদ্ধ কুঠুরীতে ইচ্ছামত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হলে থার্মোস্ট্যাটের সাহায্য নওয়া প্রয়োজন। নমুনা হিসাবে এরূপ একটা থার্মোস্ট্যাট তোমরা খুব সহজেই তৈরী করে দেখতে পার। এর জন্যে দরকার হবে

একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড, টিন আর পিতলের দুখানা পাতলা পাত, কার্বন-পেন্সিল, কিছু সরু ইলেকট্রিক তার, ১২-ভোল্ট ২৬-ওয়াটের একটা ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব, আর কিছু স্ক্রু ও বল্টু।

টিন ও পিতলের পাত থেকে লম্বা করে দুটো সরু ফালি কেটে নিয়ে একটার উপর আরেকটা রেখে বল্টু দিয়ে এক সঙ্গে এঁটে দাও। ছবির ক-চিহ্নিত জিনিসটার মত একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড তৈরী করতে হবে। এই কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে একটা ছিদ্র করে ছবির মত ব্যবস্থায় কার্বন-পেন্সিল বসিয়ে দাও। এবার পিতল ও টিনের জোড়া ফালিটাকে খাড়াভাবে স্ট্যাণ্ডের নীচের দিকে এঁটে দাও; পিতলের পাতটা যেন কার্বন-পেন্সিলের গায়ে



থার্মোস্ট্যাট

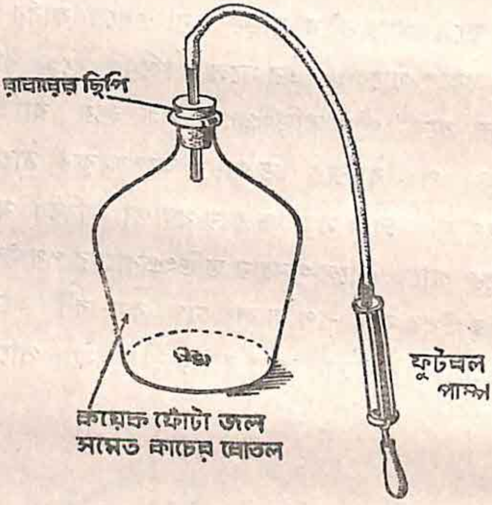
লেগে থাকে। এবার ১২-ভোল্টের বাতিটাকে একখানা কাঠের বোর্ডের উপর বসিয়ে পাতের সঙ্গে সংলগ্ন একটা তার বাতির এক প্রান্তে সংযোগ করে দাও। কার্বন-পেন্সিল সংলগ্ন একগাছা তারের প্রান্ত এবং বাতির অপর প্রান্তসংলগ্ন আরেক গাছা তারের প্রান্ত-১২ ভোল্টের ব্যাটারীতে লাগিয়ে দিলেই তড়িৎ প্রবাহিত

হয়ে বাতিটি জ্বলে উঠবে। ছবির খ-চিহ্নিত অংশ দেখে নাও। এবার এই সম্পূর্ণ জিনিসটার উপর—নীচের দিক খোলা একটা কাঠের বাক্স চাপা দাও। ভিতরের অবস্থা দেখবার জন্যে বাক্সটার গায়ে ছোট্ট একটা ছিদ্র রাখা দরকার। বাতি জ্বলবার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাক্সের ভিতরটা বেশ গরম হয়ে উঠবে। উত্তপ্ত হওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে টিন ও পিতলের জোড়া পাতাখানাও বাড়তে থাকবে। কিন্তু পিতলের পাতখানা টিনের পাতের চেয়ে বেশী বাড়বার ফলে খাড়াভাবে বাড়তে না পেরে কার্বন-পেন্সিলের বিপরীত দিকে বেঁকে যাবে। এর ফলে কার্বনের সঙ্গে পাতাখানার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে এবং তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে বাতিটা নিবে যাবে। কিছুক্ষণ পর বাক্সের ভিতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতখানা আবার সঙ্কুচিত হয়ে যথাস্থানে ফিরে যাবে এবং কার্বন-পেন্সিলের গায়ে লেগে পুনরায় তড়িৎপ্রবাহের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। পাতের উপর কার্বন-পেন্সিলের চাপ কম-বেশী করে বাক্সের ভিতরে যে কোন নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ বজায় রাখা যেতে পারে।

পরীক্ষাগারে কুয়াসা উৎপাদন

শীতকালে সবাই তোমরা মাঝে মাঝে কুয়াসা হতে দেখেছ। সময় সময় কুয়াসা এত ঘন হয় যে, কাছের মানুষও চেনা যায় না। এই কুয়াসা হয় কেন, বলতে পার? হঠাৎ ঠাণ্ডা হলেই বাতাসের জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং কুয়াসার সৃষ্টি করে। শিল্পাঞ্চলে যেখানে কলকারখানার ধোঁয়া বেশী অথবা যে সব জায়গায় ধূলাবালির আধিক্য, সেখানেই সাধারণতঃ কুয়াসা খুব ঘন হয়ে থাকে। খুব সহজ ব্যবস্থায় একটা পরীক্ষা করে তোমরাও কুয়াসা সৃষ্টি করে দেখতে পার।

পরীক্ষার জন্যে সরু মুখওয়ালা খুব মোটা একটা কাচের বোতল যোগাড় করতে হবে। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি রাখবার জন্যে সরুমুখ জালার মত এক রকমের বোতল পাওয়া যায়। এই বোতলকে ইংরেজীতে বলে কারবয়। এই রকমের একটা কারবয়ের মুখে আঁটবার জন্যে একটা রাবারের ছিপি, চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সরু এক টুকরো কাচের নল এবং খানিকটা রাবারের নল দরকার ; আর যোগাড় করতে হবে একটা ফুটবল-পাম্প।



কুয়াসা উৎপাদক যন্ত্র

রাবারের ছিপিটার মধ্যস্থলে এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে কাচের নলটা পরিয়ে দাও। তারপর কাচের নলের সঙ্গে রাবারের পাইপটি পরিয়ে অপর মুখটি ফুটবল-পাম্পের সঙ্গে এঁটে দাও। এবার বোতলটার মধ্যে কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে কাচের নল-পরানো ছিপিটা বোতলের মুখে এঁটে দিয়ে পাম্পের সাহায্যে বোতলের ভিতরে বেশ খানিকটা হাওয়া ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর বোতলের মুখ থেকে ছিপিটাকে একটানে খুলে নিলেই বোতলের বাতাস অকস্মাৎ প্রসারিত হওয়ার ফলে তাপ কমে যাবে

এবং বোতলের ভিতরে জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুর আকার ধারণ করে কুয়াসার সৃষ্টি করবে। বোতলের ভিতরে যদি সামান্য একটু সিগারেটের ধোঁয়া দেওয়া হয় তাহলে বোতলের ভিতর ঘন কুয়াসার সৃষ্টি হবে।

তাপ সঞ্চালনের পরীক্ষা

লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থমাত্রেরই কম-বেশী তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু রেশম, পশম, কাঠ, কাগজ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা নেই। ধাতব পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা আছে বলেই খনির মধ্যে বিস্ফোরণ এড়াবার জন্যে তারের জালের সাহায্যে ডেভিস্ সেফ্টি ল্যাম্প তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল—একথা বোধহয় তোমরা সবাই জান। ধাতব পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতার পরীক্ষা তোমরা অবশ্য অনেক রকমেই করে দেখতে পার; কিন্তু তোমাদের এখন তাপ সঞ্চালনের একটা কৌতুকপ্রদ পরীক্ষার কথা বলছি। সহজেই তোমরা পরীক্ষাটা করে দেখতে পারবে।



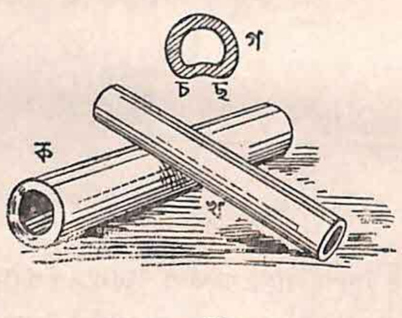
কাগজ ও টাকার সাহায্যে তাপ সঞ্চালনের পরীক্ষা

পোস্টকার্ডের মত একখানা সাদা কাগজের উপর একটা টাকা রাখ। টাকাসমেত কাগজটাকে গ্যাস-বার্ণার বা স্পিরিট ল্যাম্পের খানিকটা উপরে ধরে, এদিক-ওদিক সরিয়ে এমনভাবে পোড়াও

যেন আগুন ধরে না যায়, অথচ আগুনের তাপে কাগজটা প্রায় কালো বা বিবর্ণ হয়ে যায়। এবার আগুনের উপর থেকে টাকাটা সরিয়ে নিলেই দেখতে পাবে, সম্পূর্ণ কাগজটা বিবর্ণ হলেও টাকাটা যেখানে ছিল সে জায়গাটা মোটেই পোড়েনি—সম্পূর্ণ সাদা রয়ে গেছে। ধাতু-নির্মিত টাকার ভিতর দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার ফলেই সে জায়গাটা পুড়তে পারেনি। ছবিটা দেখে নাও, পরীক্ষাটা কেমন করে করতে হবে সহজেই বুঝতে পারবে।

ঠাণ্ডা ও গরম ধাতব নলের পরস্পর সংস্পর্শে সুর উৎপাদন

এই পরীক্ষাটা খুবই সহজ--অনায়াসেই তোমরা করে দেখতে পারবে। পরীক্ষার জন্যে প্রায় ইঞ্চিখানেক মোটা ও ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা এক টুকরো সীসার পাইপ, আর ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা একটা পুরু পিতলের নল যোগাড় করতে হবে। পিতলের নলটা বাইরের দিকে প্রায় ¾ ইঞ্চি মোটা হলেই চলবে। পরীক্ষার সরঞ্জামের মধ্যে এই দুটি জিনিসেরই দরকার।

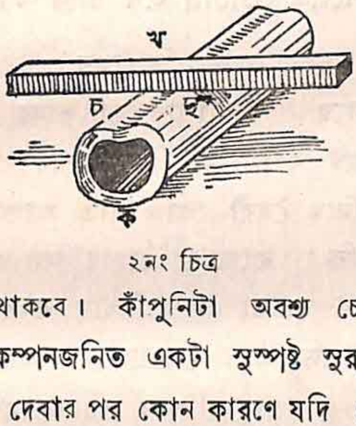


১ নং চিত্র

সীসার পাইপটা যাতে গড়িয়ে যেতে না পারে সে জন্যে একটা দিক বরাবর একটু চ্যাপ্টা করে নিয়ে উপরের দিকটা ঘযে মেজে

বেশ মসৃণ করতে হবে। পিতলের নলটারও একটা দিকের খানিকটা উখায় ঘষে পাতলা করে নিয়ে হাতুড়ির ঘা দিয়ে বা পাঞ্চিং মেসিনে চেপে লম্বালম্বি একটা খাঁজ করে দিতে হবে। এর ফলে নলের মুখটাকে ১ নম্বরের গ চিত্রের মত দেখাবে, অর্থাৎ নলের বাইরের দিকে চ ও ছ-চিহ্নিত স্থান দুটো খাঁজের দু পাশে উঁচু পাড়ের মত দেখাবে।

এবার খ-চিহ্নিত পিতলের নলটাকে গরম করে ক-চিহ্নত সীসার পাইপটার উপর ১ নম্বরের ছবির মত করে বসিয়ে দাও। বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই পিতলের নলটা অতি দ্রুতগতিতে নিয়মিত-



২নং চিত্র

ভাবে কাঁপতে থাকবে। কাঁপুনিটা অবশ্য চোখে দেখা যাবে না ; কিন্তু দ্রুত কম্পনজনিত একটা সুস্পষ্ট সুর শুনতে পাবে। গরম নলটা বসিয়ে দেবার পর কোন কারণে যদি সেটা না কাঁপে, অর্থাৎ শব্দ না শোনা যায় তবে একটুখানি নাড়িয়ে দিলেই কম্পন সুরু হবে। কেন এমন হয়, সে কথা সহজেই বুঝতে পার। গরম নলটা সীসার পাইপের যে জায়গায় সংলগ্ন হয়, সেখানটা অতি সামান্য হলেও একটুখানি উঁচু হয়ে ওঠে। উঁচু হওয়াটা দ্রুতগতিতে পর্যায়ক্রমে একবার এদিক, আবার ওদিকে হয় বলে নলটা কাঁপতে থাকে এবং তার ফলেই একটানা একটা সুর শুনতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষাটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। ২ নম্বরের ছবিখানা দেখে নাও। এখানে পূর্বের পরীক্ষার পিতলের নলের পরিবর্তে

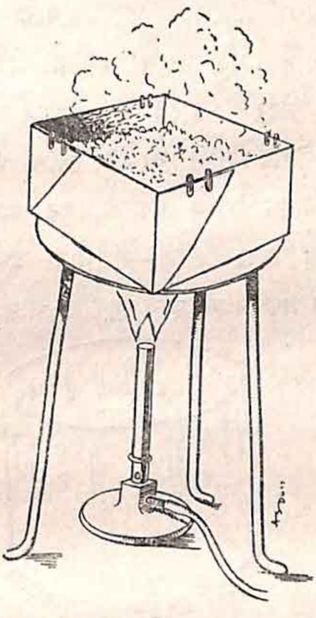
ক-চিহ্নিত সীসার পাইপটার উপরের দিকে চ ও ছ-চিহ্নিত দুটি উঁচু পার তোলা হয়েছে। এর উপরে যদি খ-চিহ্নিত জিনিসটির মত পিতলের এক খণ্ড চ্যাপ্টা বাঁট গরম করে রাখা যায় তবে ঠিক পূর্বের পরীক্ষার মতই বাঁটটা কাঁপতে থাকবে। অবশ্য এর কম্পন হবে অনেকটা মন্থর গতিতে। কাজেই সুরটা তীক্ষ্ণ না হয়ে গম্ভীর শোনাবে।

কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা

আগুনে পোড়ে না এমন কোন জিনিসের তৈরী পাত্রে করেই লোকে জল গরম করে—এই ব্যাপার তো তোমরা হামেশাই দেখতে পাও। কিন্তু সহজেই আগুন ধরে যায় এমন কোন জিনিস—যেমন ধর কাগজ দিয়ে তৈরী কোন পাত্র আগুনের উপর রেখে জল গরম করা যায় কি? কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা যায়, তোমাদের অনেকেই হয়তো একথা বিশ্বাস করবার ভরসা পাবে না; কারন তোমরা তো আর ঠোঙায় জল গরম করবার চেষ্টা করে দেখ নি! কিন্তু এতে অবিশ্বাস করবার মত কিছুই নেই; একবার পরীক্ষা করে দেখলেই সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

একটু মোটা কাগজ ভাঁজ করে চৌকো একটা ঠোঙা তৈরী কর। ঠোঙাটাকে ক্লিপ দিয়ে, না হয় আঠা দিয়েও জুড়তে পার। কিন্তু ক্লিপ ছাড়া আঠা দিয়ে জুড়লে জলে ভিজে ঠোঙা খুলে গিয়ে গরম জল ছড়িয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে। ঠোঙায় জল ভর্তি করে সেটাকে এবার ছবির মত করে একটা স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে দাও। কাগজ ভিজে গিয়ে জলের ভারে ঠোঙার তলা ফেঁসে যাবার আশঙ্কা থাকলে সরু তারের জালতির উপর সেটাকে বসিয়ে দিতে পার। এবার ঠোঙার নীচে গ্যাস বার্ণার বা স্পিরিট

ল্যাম্প জ্বেলে জল ফোটাতে থাক। দেখবে, জল ফুটে বাষ্প উঠছে, কিন্তু কাগজের ঠোঙা একটুও পোড়ে নি। যে কোন দাহ্য পদার্থই হোক না কেন, আগুন ধরবার আগে সেটার যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঠোঙার যে জায়গাটায়



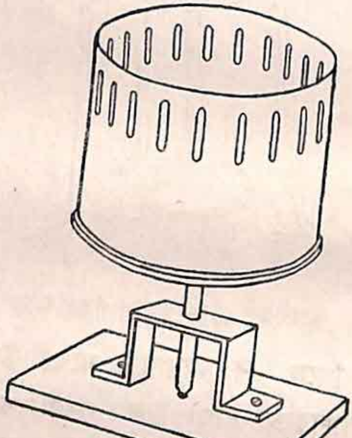
কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা

আগুনের আঁচ লাগছে, সে জায়গাটা যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়ার পূর্বেই চারিদিকের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জল সঞ্চালিত হয়ে তার তাপ সরিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই উপযুক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত হতে না পারায় কাগজের ঠোঙায় আগুন ধরে না।

জীবন চক্র

যে কোন জিনিসের বিভিন্ন অবস্থার ছবি দ্রুতগতিতে পর পর চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে সেটাকে চলন্ত পদার্থ বলে মনে

হবে। সিনেমার পর্দায় তোমরা যে সব সচল ছবি দেখ, তার মূল রহস্য এখানেই। অর্থাৎ ব্যাপারটা হলো এই যে, যে কোন পদার্থের উপরই আমাদের দৃষ্টি পড়ুক না কেন, তা থেকে চোখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ছাপ আমাদের চোখ থেকে মুছে যায় না—সামান্য কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। চোখের পর্দা থেকে বস্তুর ছাপ মুছে যেতে না যেতেই যদি সেই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার ছবি পর পর দৃষ্টিপথে আনা যায়, তাহলে তাকে সঞ্চরণক্ষম বা চলন্ত বলে মনে হবে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই চলন্ত ছবি দেখাবার জন্যে জিওট্রোপ বা জীবনচক্র নামে এক রকমের খেলনা তৈরী হয়েছিল। যন্ত্রটা তৈরীর উপায় বলে দিচ্ছি—তোমরা অনায়াসেই এই রকমের জীবনচক্র তৈরী করে সঞ্চরণক্ষম ছবি দেখতে পার।



জীবন চক্র

ছয় ইঞ্চি খাড়াই ও চার ইঞ্চি ব্যাসের একটা কাগজের ড্রাম তৈরী কর। ড্রামটার উপরের দিকে চারধারে পর পর সমান দূরত্বে লম্বা অথচ সরু কতকগুলি ফাঁক কেটে নাও। ড্রামটার ভিতরের দিকে, সরু ফাঁকগুলির নীচে, কোন কিছু কাজে ব্যস্ত মানুষ অথবা কোন জন্তুর বিভিন্ন অবস্থার ছবি পর পর এঁটে দাও। ড্রামটার

মুখের মাপ অনুযায়ী একখানা পাতলা কাঠের চাক্‌তি তৈরী করে সেটার ঠিক কেন্দ্রস্থলে ফুটো করে তাতে সরু একটা রড এঁটে তার অপর মুখটা সূচলো করে নাও। রডসমেত চাক্‌তিটাকে ড্রামের নীচের দিকে চেপে বসিয়ে দাও। রডটা যেন বাইরের দিকে থাকে। টিনের একখানা সরু ফালি বাঁকিয়ে নিয়ে একখানা কাঠের উপর স্ক্রু এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। টিনের এই ফালিটার ঠিক মাঝখানটায় রডের মাপমত একটা ছিদ্র করে ড্রামসমেত ওই ছিদ্রের মধ্যে ছবির মত করে বসিয়ে দাও। রডের সূচলো মুখটা কাঠের উপর আলতো-ভাবে থাকবার ফলে ড্রামটাকে একবার ঘুরিয়ে দিলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকবে। এবার ঘূর্ণায়মান ড্রামটার লম্বা ফাঁকের মধ্য দিয়ে ঠিক একদিকে তাকিয়ে থাকলেই মনে হবে, ড্রামের ভিতরের দিকে লাগানো ছবিগুলি যেন জীবন্ত ছবির মতো নড়াচড়া করছে। একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার পর পর তোলা ফটোগ্রাফের ছবি এভাবে সাজিয়ে নিলে নিখুঁত জীবন্ত ছবি দেখা যাবে।

ডিমের লাট্টু

আমেরিকা আবিষ্কারের পর এক ভোজসভায় কলাম্বাসকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—বলুন তো আমেরিকা আবিষ্কারে এমন কি কৃতিত্ব আছে, যাতে আপনি অত বড় একটা গৌরবের অধিকারী হতে পারেন? এ কাজ তো যে সে-ই করতে পারতো! কলাম্বাস সে কথার জবাব না দিয়ে সেই লোকটিকে একটি ডিম দিয়ে বললেন —ডিমটাকে টেবিলের উপর খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখুন তো! কিন্তু সে কোন রকমেই ডিমটাকে দাঁড় করাতে সমর্থ হলো না। একে একে সবাই চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু কেউ কৃতকার্য হলো না। কলাম্বাস তখন ডিমটাকে নিয়ে তার একটা দিক ভেঙ্গে ফেলে

সেটাকে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। সবাই তখন বললো —এ আর কি হলো, যে কেউই তো এভাবে ডিমটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারতো! কলাম্বাস বললেন—হ্যাঁ, সবাই পারতো বটে, কিন্তু উপায়টা দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কেউ সেটা করতে পারেন নি।



১ নং চিত্র

কলাম্বাস ডিমটার একদিক ভেঙ্গে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ডিমটাকে না ভেঙ্গেও যে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়, কলাম্বাসের বোধ হয় সে উপায়টা জানা ছিল না। সেই উপায়টা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। একটু অভ্যাস করলেই ডিমটাকে না ভেঙ্গেও টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবে।

একটা ডিম নিয়ে খোলাটার দু-দিকে দুটো ছিদ্র কর। একদিকের ছিদ্রে মুখ দিয়ে জোরে ফুঁ দাও। ডিমের চট্‌চটে তরল পদার্থটা প্রথমে বেরিয়ে আসবে। তারপর বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে আবার জোরে ফুঁ দাও। এবার হল্‌দে পদার্থটা বেরিয়ে আসবে। এভাবে ভিতরের সব কিছু বের করে ফেলবার পর মোম দিয়ে বেশ মসৃণভাবে ছিদ্র দুটো বন্ধ করে ডিমটাকে টেবিলের উপর রাখ

ডিমটা শয়ানভাবেই পড়ে থাকবে। এবার দু-আঙ্গুলে ধরে হেচ্‌কা একটা মোচড় দিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দাও। এক নম্বরের ছবি দেখ। শয়ানভাবে ঘোরবার মুখেই ডিমটা হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠবে এবং



২নং চিত্র

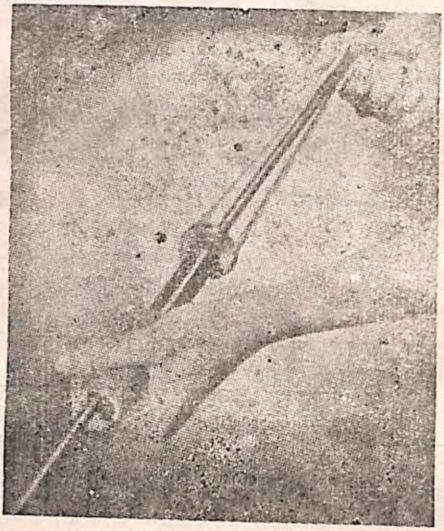
লাট্টুর মত খাড়াভাবেই ঘুরতে থাকবে। মোচড় দিয়ে ঘোরাবার কায়দাটা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারলে শয়ানভাবে ঘূর্ণায়মান ডিমটার লাট্টুর মত খাড়া হয়ে ওঠবার ব্যাপারটাকে খুবই কৌতুকাবহ মনে হবে। ২নং চিত্র দেখ।

বর্শা ছোড়বার গুল্‌তি

তোমাদের অনেকেরই হয়তো মাছ ধরবার উৎসাহ আছে এবং মাছ ধরবার জন্যে ছিপ ব্যবহার করে থাক। কিন্তু অনেক রকম অসুবিধার জন্যে অনেকে ছিপ ব্যবহার পছন্দ করে না। যারা ছিপ ব্যবহার পছন্দ করে না অথচ মাছশিকারে উৎসাহী, তাদের জন্যে সহজসাধ্য এক রকম যন্ত্র তৈরীর কথা বলছি। প্রায় ফুটদেড়েক

লম্বা নলের মত একটা যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেশ দূর থেকে বর্শা ছুড়ে অতি সহজেই মাছ শিকার করতে পারবে।

যন্ত্রটা বিশেষ কিছুই নয়। ফুটদেড়েক লম্বা গোলাকার একখণ্ড কাঠের ভিতর দিয়ে বরাবর বেশ মোটা একটা ছিদ্র করে নাও। ছিদ্র করবার পর কাঠখানা একটা নল বা পাইপের মত হবে। এই কাঠের নলের এক প্রান্তে কাটিমের মত করে ছিদ্র-করা একখানা চাক্‌তি

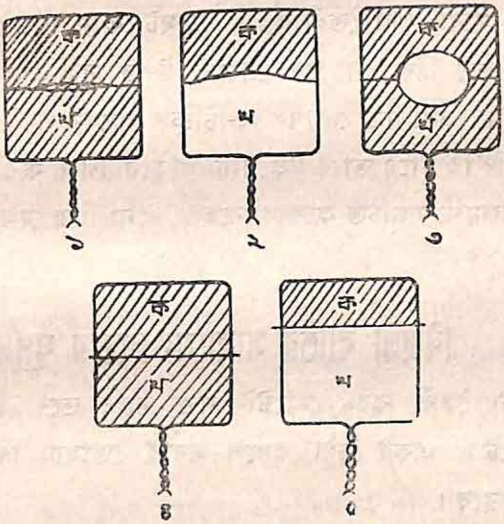


বর্শা ছোড়া গুল্‌তি

জুড়ে দিতে হবে; অথবা সম্পূর্ণ কাঠখানাকে লেদ যন্ত্রে কেটেও নিতে পার। হাতে ধরবার সুবিধার জন্যে কাঠের নলটার সামনের দিকের খানিকটা অংশ একটু মোটা রাখবে। ছবিটা দেখেই বুঝতে পারবে —নলটা কিভাবে তৈরী করতে হবে। তারপর চাকতিখানার পিছনে বেশ লম্বা ও পুরু একটা রাবারের ফিতা জুড়ে দাও। এবার ওই নলের ভিতর তীক্ষ্মমুখ ছোট্ট বর্শা গলিয়ে দিয়ে পাখী মারা গুল্‌তির মত করে ছুড়ে অনায়াসেই মাছ-শিকারে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

তরল পদার্থের তল-টানের পরীক্ষা

এক ফোঁটা জল বা এক বিন্দু পারা সর্বদাই গোল হয়ে থাকে কেন? সব রকম তরল পদার্থের উপরিভাগই যেন খুব পাতলা একটা পর্দার মত। এই পর্দা তার আয়তন যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করবার জন্যই চেষ্টা করে। একেই বলা হয় তল-টান, ইংরেজীতে বলে Surface tension। এই তল-টানের জন্যেই একবিন্দু পারা বা এক ফোঁটা জল গোলাকৃতি ধারণ করে। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে তরল পদার্থের উপরিভাগের এই সঙ্কোচন ক্ষমতা, অর্থাৎ তল-টান প্রত্যক্ষ করতে পার। এই রকমের একটা পরীক্ষার কথা বলছি।



তরল পদার্থের তল-টানের পরীক্ষা

সরু একগাছা তার বাঁকিয়ে ছবির মত করে ছোট্ট একটা ফ্রেম তৈরী করে নাও। এবার ফ্রেমটার মাঝামাঝি জায়গায় এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত খুব আল্‌তোভাবে সরু একগাছা সুতা বেঁধে দাও। সুতাটার মাঝখানে আল্‌গা একটা ফাঁস রেখে দেবে। সুতাবাঁধা

ফ্রেমটাকে সাবানের জলে ডুবিয়ে নিলেই ফ্রেমটা জুড়ে একটা সাবান-জলের পাতলা পর্দা তৈরী হবে। ১নং চিত্র দেখ। এবার সাবান-জলের পর্দার খ-চিহ্নিত অংশটাকে ছিঁড়ে দাও। দেখবে, ক-চিহ্নিত অংশের সাবান-জলের পর্দা আল্‌তোভাবে-বাঁধা সুতাটাকে টেনে নিয়ে ধনুকের আকারে টান করে বাঁকিয়ে রেখেছে। ২নং চিত্র দেখ।

ফ্রেমটাকে আবার সাবান-জলে ডুবিয়ে নাও। এবার সুতার ফাঁসের ভিতরের অংশটার পর্দা ছিঁড়ে দাও। চারদিক থেকেই পর্দার সমান টানের ফলে সুতার ফাঁসটা এবার গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ৩নং চিত্র দেখ।

ফ্রেমে-বাঁধা সুতাটা এবার খুলে নাও। সাবান-জলে ডুবিয়ে ফ্রেমটার মধ্যে পর্দা তৈরী কর। ফ্রেমটাকে শয়ানভাবে ধরে সুতাটা যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে ফ্রেমের উপর সরু এবং সোজা একখণ্ড তার রাখ। ৪নং চিত্র দেখ। খ-চিহ্নিত অংশের পর্দা ছিঁড়ে দাও। দেখবে, পর্দার টানে তারে টুকরোটা গড়িয়ে গিয়ে ক-চিহ্নিত অংশের আয়তন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে আনছে। ৫নং চিত্র দেখ।

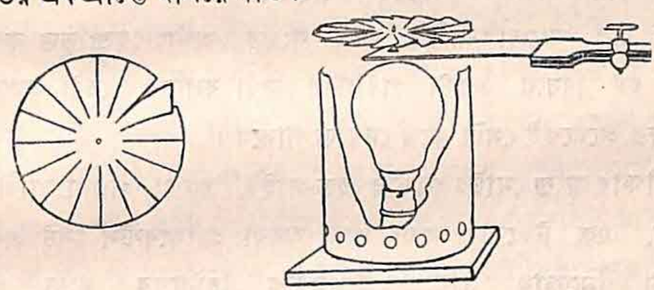
বিজলী বাতির সাহায্যে চক্রের ঘূর্ণন

এই যন্ত্রটা তৈরী করা মোটেই শক্ত নয়; তবে কিছুটা ঝঞ্ঝাট আছে বটে! একটু চেষ্টা করলে সবাই তোমরা জিনিসটা তৈরী করতে পারবে।

সিগারেটের কৌটা প্রভৃতির মুখে যে পাতলা টিনের পর্দার একটা আবরণ দেওয়া থাকে, সেরূপ একটা পাতলা টিনের পর্দা যোগাড় কর। পর্দাটার উপর কম্পাস দিয়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি ব্যাসার্ধের বৃত্ত এঁকে নাও। তারপর কাঁচি দিয়ে সেটাকে গোল করে কেটে ফেল এবং কেন্দ্রস্থলে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র কর। চাক্‌তি-

খানাকে এবার বাঁ-দিকের চিত্রানুযায়ী পাখার ব্লেডের মত সমান ভাগে কয়েকটি অংশে কেটে নাও এবং প্রত্যেকটি ব্লেডকে ৪৫° ডিগ্রি কোণ করে বাঁকিয়ে দাও। সবগুলির বাঁক যেন সমান হয়, নচেৎ ভারসাম্য রক্ষা হবে না।

একটা গ্রামোফোনের পিনের সূচালো ডগাটা উপরের দিকে রেখে গোড়ার দিকটা রাং-ঝাল দিয়ে সরু একখানা পিতলের লম্বা পাতের একপ্রান্তে বসিয়ে দাও।



বাতির উপরে ঘূর্ণায়মান চক্র

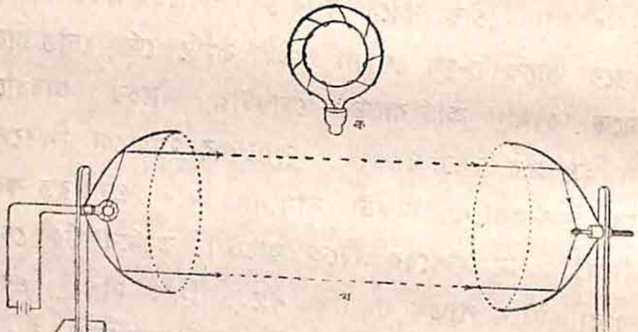
ছোট্ট একখানা চৌকা কাঠের উপর ১০০ ওয়াটের একটা বিজলী বাতি বসিয়ে তাকে ছু-মুখ খোলা একটা কার্ডবোর্ডের চোঙ দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। কার্ডবোর্ডের চোঙটার নীচের চারধারে কতকগুলি ছিদ্র করে দেওয়া দরকার। ক্ল্যাম্পের সাহায্যে পিতলের পাতখানার পিন-বসানো দিকটা সামনের দিকে প্রসারিত করে দাও। পিনটা যেন উপরের দিকে থাকে। কার্ডবোর্ডের চোঙ দিয়ে ঘেরা বাতিটাকে পাতখানার ঠিক নীচে বসিয়ে দাও। এবার পাখার ব্লেডের মত তৈরী টিনের চাকৃতিখানা পিনের মাথায় বসিয়ে সুইচ টিপে আলোটাকে জ্বেলে দেবার কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে, চাকৃতিটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। বাতি ও চাকৃতিটাকে কি ভাবে বসাতে হবে—ছবি থেকেই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

চাকৃতিখানার কিছু উপরে একখানা সাদা কাগজ ধরলে চলন্ত ছায়াগুলিকে মনে হবে যেন ধোঁয়া উঠছে।

উত্তাপ প্রতিফলনের পরীক্ষা

তোমরা সকলেই একথা জান যে, আয়না বা কোন মসৃণ পদার্থের উপর আলো ফেললে সেটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। কেবল আলোই নয়, উত্তাপের বেলায়ও ঠিক একই রকমের ব্যাপার ঘটে। প্যারাবোলিক মিররের সাহায্যে প্রতিফলিত উত্তাপ-তরঙ্গকে ঠিক আলোক-রশ্মির মতই সংহত অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত করা যায়। এই বিষয়ে একটা পরীক্ষার কথা বলছি। চেষ্টা করলে তোমাদের অনেকেই সেটা করে দেখতে পারবে।

পরীক্ষার জন্যে মোটর গাড়ীর হেড-লাইট, অর্থাৎ প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর, এক টুকরো অভ্রের পাত অথবা অ্যাস্‌বেস্টস সিট এবং খানিকটা নিক্রোম তার (ইলেকট্রিক হিটারের মধ্যে যে রকমের তার থাকে) যোগাড় করতে হবে। হেড-লাইটের মধ্যে



উত্তাপ প্রতিফলনের পরীক্ষা

যে বাল্‌ব থাকে, সে রকমের একটা অকেজো বাল্‌ব সংগ্রহ করে সেটাকে সাবধানে ভেঙে ফেল। পিতলের ক্যাপটার মধ্য দিয়ে যে দুটো তার ভিতরে চলে গেছে সে তার দুটো যেন নষ্ট না হয়। অবশ্য এই তার দুটার সঙ্গে সংযুক্ত ফিলামেন্টের কুণ্ডলীটাকে

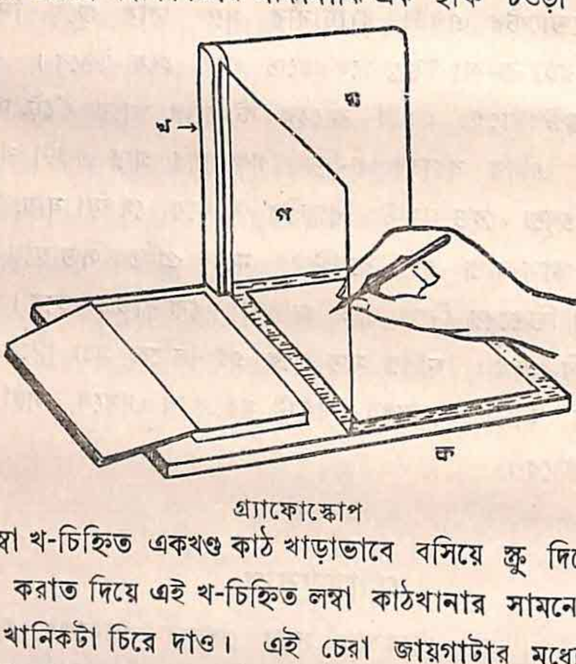
ফেলে দিতে হবে। তারপর অভ্র বা অ্যাস্‌বেস্টসের পাতখানাকে কেটে ক-চিহ্নিত চিত্রের মত একটি ফর্মা তৈরী কর। প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা ২৭ নম্বরের নিক্রোম তার ঐ ফর্মাটার গায়ে জড়িয়ে তারের দু-প্রান্ত ক্যাপের মধ্যেকার তার দুটোর সঙ্গে মোচড় দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। তার জড়ানো ফ্রেম্‌টাকে প্লাস্টেসিনের সাহায্যে ক্যাপের মধ্যে বসিয়ে হেড-লাইট রিফ্লেক্টরের সকেটে লাগিয়ে দাও। এবার ১২ ভোল্টের একটা ব্যাটারীর সঙ্গে তার জুড়ে দি:লই নিক্রোম তারটা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে হতে লাল হয়ে উঠবে। হেড-লাইট রিফ্লেক্টরটাকে একটা কাঠের স্ট্যাণ্ডের গায়ে এঁটে দাও। এবার যদি এটার বরাবর দু-তিন গজ দূরে আর একটা খালি, অর্থাৎ বাতিশূন্য হেড-লাইট রিফ্লেক্টর বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে সমান্তরাল তাপ-রশ্মি এই রিফ্লেক্টরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে তার ছিদ্র বরাবর ভিতরের দিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হবে। খ-চিহ্নিত ছবি দেখ। ছবির মত করে এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যদি দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের দিকটা ধর তবে দেখবে, সেটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে।

গ্র্যাফোস্কোপ

ম্যাপ, ছবি বা নক্সা আঁকবার সময় তোমরা অনেকেই হয়তো খুব অসুবিধা ভোগ কর। অভ্যস্ত হলেও ভারতবর্ষ বা বাংলা দেশের একখানা ম্যাপ আঁকতে গলদঘর্ম হতে হয়; কাজেই কপি করা ছাড়া উপায় থাকে না। সাধারণ ছবির উপর পাত্‌লা কাগজ চেপে তার উপর পেন্সিল বুলিয়ে কপি করবার ব্যবস্থা তোমাদের জানা আছে—তাতে কিন্তু সব জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। এসব জিনিস নিখুঁৎভাবে কপি করবার সহজ ব্যবস্থা হয়তো তোমাদের অনেকেরই জানা নেই। খুব সহজে এসব জিনিস কপি

করবার একটা ব্যবস্থার কথা বলে দিচ্ছি। করে দেখো—কত সহজে অথচ সুন্দরভাবে কপি করা যায়। কপি করবার এই যন্ত্রটাকে বলা হয় গ্র্যাফোস্কোপ। নিজের হাতেই এরূপ একটা গ্র্যাফোস্কোপ তৈরী করে নিতে পার, মাত্র কয়েক টুকরো কাঠ আর একখানা চৌকা কাচ মাত্র দরকার হবে।

প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং আধ ইঞ্চি পুরু ক-চিহ্নিত একখানা তক্তার লম্বা দিকটার মাঝামাঝি এক ইঞ্চি চওড়া এবং দশ



গ্র্যাফোস্কোপ

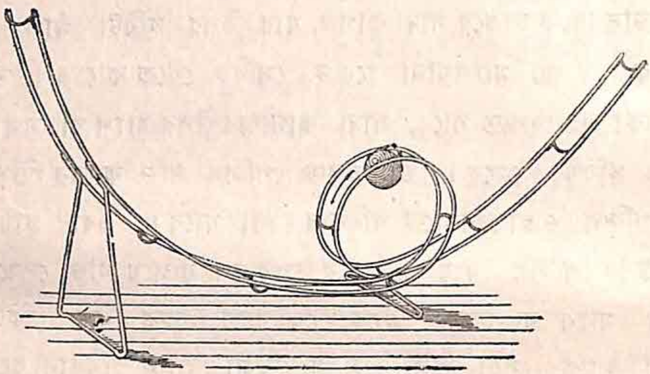
ইঞ্চি লম্বা খ-চিহ্নিত একখণ্ড কাঠ খাড়াভাবে বসিয়ে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। করাত দিয়ে এই খ-চিহ্নিত লম্বা কাঠখানার সামনের দিকে বরাবর খানিকটা চিরে দাও। এই চেরা জায়গাটার মধ্যেই (গ-চিহ্নিত) পরিষ্কার একখানা চৌকো কাচ ছবির মত করে বসিয়ে দিতে হবে। ঘ-চিহ্নিত তিন পিস্ কাঠের একখানা চৌকো বোর্ড ক-চিহ্নিত তক্তার ধারের গায়ে কাচখানার সমকোণে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। এবার ক-চিহ্নিত তক্তা এবং ঘ-চিহ্নিত বোর্ডের সামনের দিকটাতে ভুসা কালি বা অন্য কোন কালো রং মাখিয়ে নিলেই যন্ত্রটা তৈরী হলো। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, কি ভাবে যন্ত্রটা তৈরী করতে হবে, সেকথা বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না।

ম্যাপ অথবা যে বই থেকে কিছু কপি করতে চাও সেটাকে খাড়া কাচখানার বাঁদিকে রাখ। এর উপর বেশ আলো পড়া চাই। কাচের ডান দিকে থাকবে সাদা কাগজ, যার উপর ছবিটা আঁকবে। যে দিকে বই বা ম্যাপখানা রয়েছে, সেদিক থেকে কাচের ভিতর দিয়ে তাকালেই দেখতে পাবে, সাদা কাগজের উপর ম্যাপ বা নক্সার পরিষ্কার ছবিটি পড়েছে। ডান হাতে পেন্সিল নাও, কাচের ভিতর দিয়ে পেন্সিল ও হাতখানাকে পরিষ্কার দেখা যাবে। এবার ছায়া-রেখার উপর পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর দাগ বুলিয়ে যাও, দেখবে অবিকল ম্যাপ বা নক্সাটি এঁকে ফেলেছ। কিন্তু এর একটা অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমার আঁকা ছবিখানা হবে উল্টো। তবে অতি সহজেই এই ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে। কাগজখানার তলায় একখানা কার্বন পেপার চিৎ করে রেখে পেন্সিল বা অন্য কোন সূক্ষ্মমুখ শলাকা দিয়ে সাদা কাগজের উপর দাগ বুলিয়ে গেলেই কার্বন পেপারের দরুন কাগজের অপর পিঠে ঠিক ছবিটি অঙ্কিত হয়ে যাবে। কাগজখানাকে উল্টোলেই দেখবে, সোজা ছবিই হয়েছে।

বলের খেলা

তোমরা জান বোধ হয়, গতিশীল বস্তু সর্বদাই সোজা পথে চলতে চায়; কিন্তু কতকগুলি প্রতিকূল শক্তির জন্যে সোজা পথে চলতে পারে না। কাজেই কোন গতিশীল পদার্থকে বাঁকা পথে চালাতে হলে তার সোজা পথে চলবার ঝোঁকটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে ঘর্ষণজনিত শক্তিক্ষয় খুব কম হয় এবং সোজা পথে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে না পারে এই রকমের কোন ব্যবস্থা করতে পারলে কোন গতিশীল পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের টান

উপেক্ষা করে খাড়াভাবে স্থাপিত বৃত্তাকার পথে ঘুরে আসবে। একটা খুব সহজ পরীক্ষার সাহায্যেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।



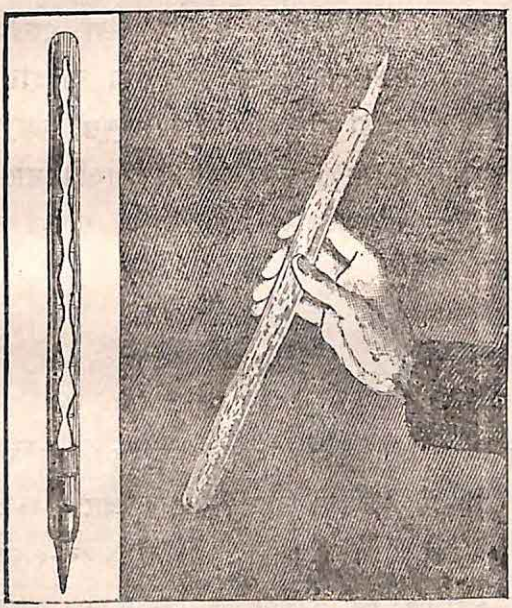
বলের খেলা

সমান মাপের লম্বা দু-গাছা সোজা তার সংগ্রহ কর। তার দু-গাছা পাশাপাশি প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি তফাতে রেখে নীচের দিকে বাঁকানো ছোট ছোট তারের টুকরো কিছুটা দূরে দূরে রাং-ঝাল দিয়ে জুড়ে দাও। জিনিসটা হবে লম্বা একটা তারের মইয়ের মত দেখতে। এবার এই তারের মইটাকে বাঁকিয়ে একদিকে ফাঁসের মত করে ঘুরিয়ে আন। তারপর এই তারের মইটার উভয় প্রান্ত বাঁকিয়ে অর্ধচন্দ্রের মত করতে হবে। এই বক্রতা যতদূর সম্ভব মসৃণ হওয়া দরকার, অর্থাৎ আঁকাবাঁকা না হয়। এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি তারের মই বা রেলটার নীচের দিকে দুটো তারের তৈরী পায়া রাং-ঝাল দিয়ে এমনভাবে জুড়ে দাও যেন আড়ভাবে বসিয়ে রাখা যায়। ছবিটা ভাল করে দেখে ঠিক ওইভাবেই তৈরী করবে। এবার এই অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি রেলটার লম্বা প্রান্তে বেশ একটি নিটোল বল ছেড়ে দিলেই দেখবে—বলটা গড়িয়ে ফাঁসের গোলাকার জায়গাটা ঘুরে অপর প্রান্তে চলে যাবে।

আলো বিকিরণকারী পারদ নল

ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তড়িতের কতকগুলি পরীক্ষার কথা পূর্বে তোমাদের বলা হয়েছে। ঘর্ষণোদ্ভূত তড়িতের আর একটি অদ্ভুত পরীক্ষার কথা বলছি। পরীক্ষার জন্যে দরকার হবে খানিকটা পারা-ভর্তি বিশেষভাবে তৈরী একটা কাচের নল। এই কাচের নল গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিয়ে তৈরী করে নিতে হবে। কিভাবে তৈরী করা দরকার, সে কথা বলছি।

ফুটখানেক লম্বা দুটো কাচের নল দরকার। একটা নল মোটা, অপরটা হবে তার চেয়ে সরু। সরু নলটাকে ব্লো করে ফুলিয়ে



আলো-দেওয়া পারদ নল

ফুলিয়ে মালার মত এক সার গুটি তুলে তার যে কোন প্রান্তের কাছাকাছি পাশের দিকে একটা ছিদ্র করে দিতে হবে। এবার

গুটি-তোলা সরু নলটাকে মোটা নলটার ভিতরে বসিয়ে ছিদ্র-করা দিকটা মোটা নলের যে কোন প্রান্তে জুড়ে দিতে হবে। গুটি-তোলা নলের অপর মুখটা থাকবে খোলা। এখন মোটা নলের এক ইঞ্চি, কি দেড় ইঞ্চি অবধি পারা ভর্তি করবার পর নলটাকে বায়ুশূন্য করে মুখ বন্ধ করে দিলেই হলো। ছবিটা ভাল করে দেখে নিয়ে গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিয়ে যন্ত্রটা অনায়াসে তৈরী করিয়ে নিতে পারবে।

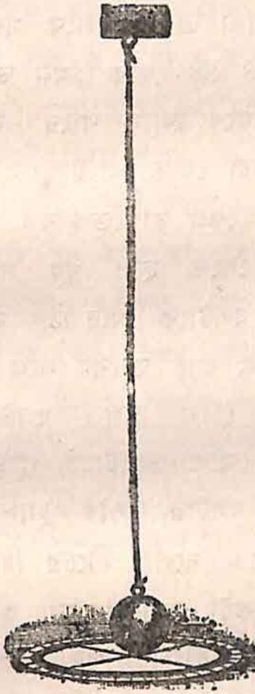
পারা-ভর্তি নলটাকে উল্টে দিলেই খানিকটা পারা গুটি-তোলা নলের ভিতর দিয়ে, আর খানিকটা তার বাইরের গা বেয়ে নীচের দিকে পড়বে। নলের ভিতর এরূপ ব্যবস্থা থাকায় পারাটা উপর থেকে নীচে পড়বার ফলে ধাক্কা লেগেও নলের নীচের দিকটা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। নলটাকে দ্রুতগতিতে বার বার উল্টে দিলে ভিতরকার পারাটা আন্দোলিত হওয়ার ফলে একরকম স্নিগ্ধ আলো নির্গত হতে থাকবে। অবশ্য দুটো নল ব্যবহার না করে একটা নলের মধ্যে খানিকটা পারা ভর্তি করে বায়ুশূন্য করলেও আলো দেখা যাবে; কিন্তু গুটি-তোলা নলে আলো পাওয়া যাবে বেশী। অন্ধকার ঘরে জিনিসটাকে চমৎকার একটা আলো দেওয়া রডের মত দেখাবে।

ফুকোস্ পেণ্ডুলাম

দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম তোমরা সবাই দেখেছ। অতি সাধারণ একটা জিনিস। সরু একগাছা রডের নীচের প্রান্তে ভারী একটা ওজন ঝুলানো। সমান তালে সেটা অনবরত এদিক-ওদিক দুল্ছে। জিনিসটা তুচ্ছ হলে কি হয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অসাধারণ! পিসা নগরীর গীর্জায় ঝুলানো একটা আলোকাধারের দোলন দেখে ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও পেণ্ডুলামের দোলনের নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। পেণ্ডুলামের বিভিন্ন ব্যবহারিক

প্রয়োগের বিষয় আলোচনা না করে তোমাদের আজ একটা খুব সরল পরীক্ষার কথা বলছি।

পৃথিবী তার নিজের অক্ষরেখার উপর পশ্চিম থেকে পূব দিকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরে চলেছে—একথা তোমরা সবাই জান। পৃথিবীর এই ঘূর্ণনের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়ার জন্যে জাইরোস্কোপ ও অন্যান্য



ফুকোস্ পেণ্ডুলাম

পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণন পরীক্ষা করবার জন্যে প্যারিসের পার্থেননে পেণ্ডুলামের সাহায্যে ফুকো এক অদ্ভুত পরীক্ষা করেন। শয়ানভাবে স্থাপিত একটা স্কেলের উপর খুব উঁচু থেকে ঝুলানো পেণ্ডুলাম দুলিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি দেখলেন যে, তার দোলন একই তালে অব্যাহত আছে বটে, কিন্তু স্কেলটি সামান্য একটু ঘুরে গেছে। এ থেকেই পৃথিবীর ঘূর্ণনের

প্রমাণ পাওয়া যায়। পরীক্ষাটি যদি উত্তর আমেরিকার কোন জায়গায় করা যায় এবং পেণ্ডুলামটি ঠিক উত্তর-দক্ষিণে দুল্‌তে থাকে তবে দক্ষিণ দিক থেকে দেখা যাবে, উত্তরের প্রান্তটি অল্প সময়ের মধ্যেই ডানদিকে সরে যাচ্ছে।

পরীক্ষাটি আর একটু ছোট ভাবে সহজেই করা যেতে পারে। ছবির মত করে ভারী একটা বলকে সরু এক গাছা লম্বা তারে বেঁধে প্রায় ৫০।৬০ ফুট উঁচু থেকে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন বলটি উত্তর-দক্ষিণে দুল্‌তে পারে (উঁচু বাড়ীর ছাদ থেকে বল ঝুলাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে)। বলটির তলায় কাগজের একখানা গোলাকার স্কেল রাখতে হবে। (ছবি দেখ)। পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল পেতে হলে খুব সতর্কভাবে পেণ্ডুলামটিকে দুলিয়ে দিতে হবে। বলটাকে ঘিরে ঠিক মাঝামাঝি সরু একগাছা তার বেঁধে দাও এবং সেই তারের সঙ্গে একগাছা সরু সুতা বেঁধে বলটাকে একদিকে টেনে রাখ। বলটা স্থির হওয়ার পর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সুতাটাকে পুড়িয়ে দেওয়া মাত্রই তার দোলন সুরু হবে। বলটার তলায় ভুসা-মাখানো কাচ রেখেও পরীক্ষা করতে পার। বলের নীচের দিকে এক টুকরো পালক লাগিয়ে দাও। পালকটা ভুসা-মাখানো কাচের গায়ে দোলন-পথের দাগ কেটে যাবে। পরীক্ষাটা খুব সহজ বটে, কিন্তু সুবিধামত স্থান নির্বাচন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদির ঝঞ্ঝাট কম নয়। চেষ্টা করে দেখো, যদি কেউ করে দেখতে পার তবে পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্বন্ধে অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হবে।

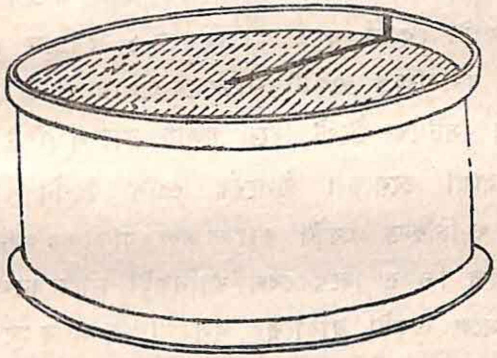
পৃথিবীর ঘূর্ণনের পরীক্ষা

ফুকোস্‌ পেণ্ডুলামের পরীক্ষায় পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তোমাদের কাছে অনেকটা পরিবর্তিত

আকারে সেই রকমের আর একটা সহজ পরীক্ষার কথা বলছি, যাতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

প্রায় ৪ ইঞ্চি খাড়াই ও আড়াই ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা পাত্রের কানা থেকে আধ ইঞ্চি নীচু অবধি জল ভর্তি কর। কোন রকম কম্পন না থাকে বা বাতাস না লাগে, এমন কোন জায়গায় জল-ভর্তি পাত্রটাকে বসিয়ে দাও। সামান্য লাইকোপোডিয়ামের গুঁড়োর দরকার হবে। ওষুধের দোকানে সামান্য ব্যয়েই জিনিসটা কিনতে পাওয়া যাবে। পাত্রটার জলের উপর সামান্য কিছু লাইকোপোডিয়ামের গুঁড়ো ছড়িয়ে দাও। গুঁড়োগুলি ছড়িয়ে গিয়ে জলের উপর খুব পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করবে।

এবার উপর থেকে খুব আল্‌তোভাবে ভুসা-কালি ছড়িয়ে জলের উপরকার আস্তরণটার মধ্যস্থল থেকে পাত্রটার ধার পর্যন্ত বেশ মোটা একটা লাইন তৈরী কর। লাইনটা যেখানে গিয়ে



জলপূর্ণ পাত্রের উপরিভাগে লাইকোপোডিয়ামের
গুঁড়ো ছড়িয়ে তার উপরে ভুসা-কালির
লাইন তৈরী করা হয়েছে

পাত্রটার গায়ে ঠেকবে সেখানে কানাটার গায়ে উপর দিকে কালো কালির একটা দাগ কেটে দাও। কি রকম করতে হবে, ছবিটা দেখে ঠিক করে নাও।

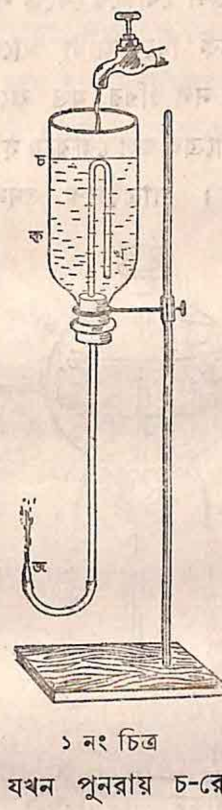
পাত্রটাকে কয়েক ঘণ্টা স্থিরভাবে রেখে দেবার পর দেখবে, জলের উপরের কালো রেখাটা পাত্রটার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরে গেছে—মনে হবে যেন ক্রমশঃ সেটা পাত্রটার চারধারে ঘুরে যাচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পাত্রটাই বাড়ীঘর সমেত পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে, জলটা কিন্তু একই জায়গায় স্থিরভাবে রয়ে গেছে।

সবিরাম ফোয়ারা ও সাইফন

ভূগোলে তোমরা বিভিন্ন দেশের উষ্ণ প্রস্রবণের কথা পড়েছ নিশ্চয়ই! এগুলির অনেকেই এক-একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ফোয়ারার আকারে বহু উর্ধ্বে জল উৎক্ষিপ্ত করে থাকে। এ সব প্রস্রবণের জল থেমে থেমে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় কেন—সাধারণ একটা পরীক্ষা থেকে সে কথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়, সাধারণ এক রকম সাইফনের পরীক্ষা মাত্র।

পরীক্ষাটা কেমন করে করতে হবে ১ নং চিত্রে সেটা দেখানো হয়েছে। ক-চিহ্নিত একটা বোতলের তলার দিকটা কেটে গেলাসের মত করে সেটাকে উল্টে দিয়ে গলায় ক্ল্যাম্প এঁটে স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। উপরের প্রান্ত উল্টো U-অক্ষরের মত বাঁকানো খ-চিহ্নিত একটা কাচের নল বোতলের গলায় আঁটা ছিদ্র-করা কর্কের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা নীচে চলে গেছে। এই নলটার সঙ্গে একটা রাবারের নল পরিয়ে অপর মুখে ড্রপারের মত ছোট্ট একটা কাচের নল এঁটে দাও। ড্রপারটাকে ছবির মত অবস্থায় রাখ। স্ট্যাণ্ডসমেত যন্ত্রটাকে এমনভাবে জলের কলের নীচে রাখ যেন ক-চিহ্নিত পাত্রটার মধ্যেই জল পড়তে পারে। এবার কলটাকে সামান্য একটু খুলে দাও, যেন খুব সরু নলে জল পড়তে পারে। জল যখন পাত্রের চ-চিহ্নিত রেখা অবধি উঠবে তখনই দেখবে, পাত্রের সব জলটা জ-নলের মুখ দিয়ে ফোয়ারার আকারে

বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোয়ারা বন্ধ হয়ে যাবে; তখনও অবশ্য কলের জল ঝির্‌ঝির্‌ করে পাত্রটার মধ্যে পড়ছে।

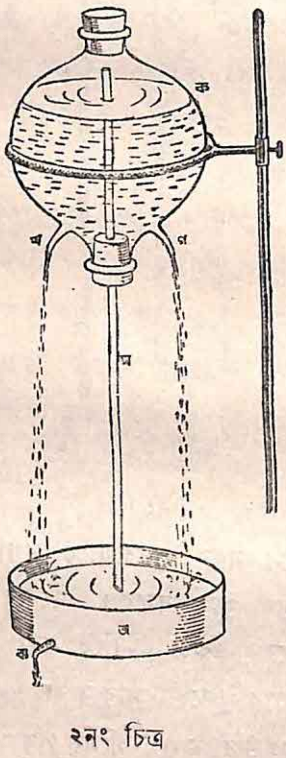


১ নং চিত্র

পাত্রে জল জমে জমে যখন পুনরায় চ-রেখা পর্যন্ত উঠবে তখনই আবার ফোয়ারার মুখ খুলে যাবে। জলের কলটা একই ভাবে খোলা রাখলে দেখবে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ফোয়ারাটা আপনা-আপনিই একবার খুলছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সবিরাম উষ্ণ প্রস্রবণগুলির ভূগর্ভস্থ জল নির্গমের পথ স্বাভাবিক কোন উপায়ে এরূপ উল্টো U-অক্ষরের মত বেঁকে থাকবার ফলে নির্দিষ্ট সময় পর পর জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

এছাড়া আর একরকম উপায়েও তোমরা সবিরাম ফোয়ারার পরীক্ষা করে দেখতে পার। ২নং চিত্র দেখে নাও। ২নং চিত্রে

ক-চিহ্নিত দু-মুখ খোলা একটা গোলাকার কাচের পাত্র স্ট্যাণ্ডের উপর বসানো আছে। পাত্রটার দু-দিকে আছে খ ও গ-চিহ্নিত দুটি নল। এই নলের ভিতর দিয়ে জল বেরিয়ে যেতে পারে। পাত্রটার নীচের মুখ ছিদ্র-করা একটা কর্ক দিয়ে আঁটা আছে। ওই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে লম্বা একটা কাচের নল ছবির মত করে বসিয়ে দিতে হবে। নলের তলায় জ-চিহ্নিত পাত্রের জল বেরিয়ে যাবার পথসমেত একটা চওড়া পাত্র বসিয়ে দাও। পাত্রটাকে এমনভাবে জল ভর্তি কর



২নং চিত্র

যেন ঘ-নলের মুখে না লেগে যায়—একটু ফাঁক থাকে। এবার ক-চিহ্নিত পাত্রের মধ্যে নলের মুখের খানিকটা নীচু অবধি জল ভর্তি করে মুখটাতে ছিপি এঁটে দাও। খ ও গ-চিহ্নিত নল দিয়ে জ-চিহ্নিত পাত্রের মধ্যে জল পড়তে থাকবে। জ-চিহ্নিত পাত্রের

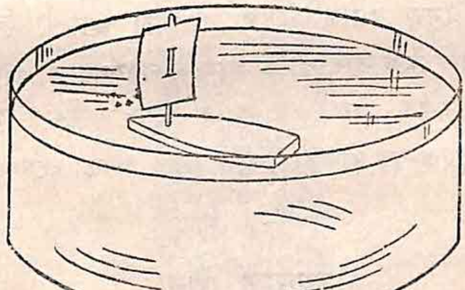
জল বৃদ্ধি পেলেই নলের মুখটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে খ, গ জলের ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে। ঝ-নলের ভিতর দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার ফলে কিছুক্ষণ বাদেই আবার ঘ-নলের মুখ থেকে জল নীচে নেমে যাবে। এর ফলে আবার খ গ নল দিয়ে জল পড়া সুরু হবে। ক-চিহ্নিত পাত্রে যতক্ষণ জল থাকবে ততক্ষণই ঠিক নির্দিষ্ট সময় পর পর খ ও গ নল দিয়ে জলের ধারা পড়তে থাকবে।

চুম্বকের খেলা

ইতিপূর্বে তোমাদের কয়েক রকমের চুম্বকের খেলার কথা বলা হয়েছে। এবার আর একটা খুব সহজ খেলার কথা বলছি। এটা তোমরা সবাই করে দেখতে পারবে

সোলা দিয়ে ছোট্ট নৌকা বা ভেলার মত জিনিস তৈরী কর। নৌকা বা ভেলার পরিবর্তে সোলার ছোট্ট হাঁসও তৈরী করতে পার।

মাঝারি গোছের গোটা তিনেক সূচ নিয়ে সেগুলিকে একমুখী করে ধর এবং তার উপরে একটা বার-ম্যাগ্‌নেটের একদিকের মুখ ডান



চুম্বক-সূচ বেঁধানো সোলার নৌকা জলের উপর ভাসছে

থেকে বাঁ-দিকে আল্‌তোভাবে বার কয়েক ঘষ্‌ড়ে নাও। ডান থেকে বাঁয়ে অথবা বাঁ থেকে ডানে, যে কোন একদিকেই কেবল ঘষ্‌ড়াতে

হবে ; একবার এদিকে, আবার ওদিকে ঘষ্‌ড়াবে না। দেখবে সূচগুলি চুম্বকের গুণ পেয়েছে।

এবার একটা চুম্বক-সূচ সোলার নৌকা অথবা হাঁসটার ভিতর চেপে ঢুকিয়ে দাও। ফুটখানেক লম্বা সরু একখণ্ড নরম কাঠের লাঠি যোগাড় কর। লাঠিটার দু-মুখে অপর দুটো সূচ চেপে ঢুকিয়ে দিতে হবে। লাঠির এক প্রান্তে সূচের ডগাটা থাকবে বাইরের দিকে, অপর প্রান্তের সূচের ডগাটা থাকবে লাঠির ভিতরের দিকে।

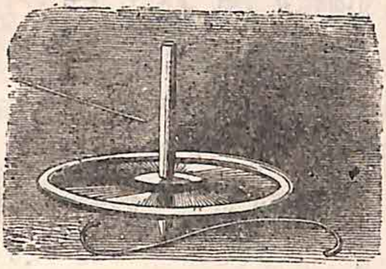
একটা বড় পাত্রের জল ভর্তি করে তাতে নৌকা অথবা হাঁসটা ভাসিয়ে দাও। বন্ধুবান্ধবদের বলবে—দেখ, নৌকাটা জলের উপর এক জায়গায় ভেসে আছে—কোন দিকেই যাচ্ছে না। কিন্তু এটা আমার আদেশ বুঝতে পারে—আমি যেদিকে যেতে বলবো, ঠিক সেদিকেই যাবে। লাঠিটার একমুখ নৌকাটার কাছাকাছি নিয়ে বলবে—এদিকে এস। নৌকাটা অমনি তোমার নির্দেশমত সেদিকেই এগিয়ে আসবে। লাঠিটার মুখ ঘুরিয়ে যদি নৌকাটাকে আবার পিছু হট্‌তে আদেশ দাও তবে সেটা পিছন দিকেই চলতে থাকবে।

কেন এমন হয়, সহজেই বুঝতে পার। প্রত্যেক চুম্বকেরই উত্তর ও দক্ষিণ দুটি মেরু আছে, একথা তোমরা জান। উভয় চুম্বকের পরস্পর বিপরীত মেরু কাছাকাছি আনলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে ; কিন্তু উভয়ের একই মেরু কাছাকাছি আনলে উভয়ে উভয়কে দূরে ঠেলে দেয়। চুম্বক-সূচ থাকবার ফলে এরূপ অবস্থা ঘটে থাকে।

চুম্বকের খেলা

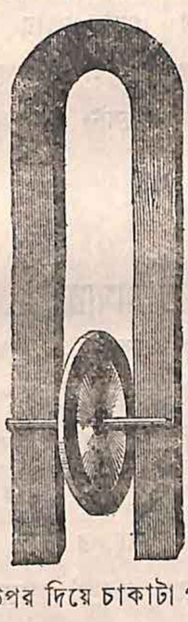
চুম্বক-লাট্টু তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই। এই লাট্টুর অক্ষদণ্ডটা (অর্থাৎ যেটার উপর লাট্টুটা ঘোরে) থাকে চুম্বক-লোহার। লাট্টুটা ঘুরিয়ে তার আলের কাছে সরু এক টুকরো বাঁকানো বা সোজা

লোহার তার ছেড়ে দিলে দেখা যাবে—তারটা একবার এদিক আবার ওদিক—অনবরত যাতায়াত করছে। অবশ্য লাট্টুটা যতক্ষণ ঘুরবে ততক্ষণই কেবল এ রকমের ব্যাপার দেখা যাবে। চুম্বক-শলাকা দিয়ে



চুম্বক লাট্টু

যে কোন রকমে এই রকমের লাট্টু তোমরা অনায়াসেই তৈরী করতে পার। কিন্তু আজ তোমাদিগকে এই ধরণের আর একটা চুম্বকের



U-চুম্বকের উপর দিয়ে চাকাটা গড়িয়ে যাচ্ছে

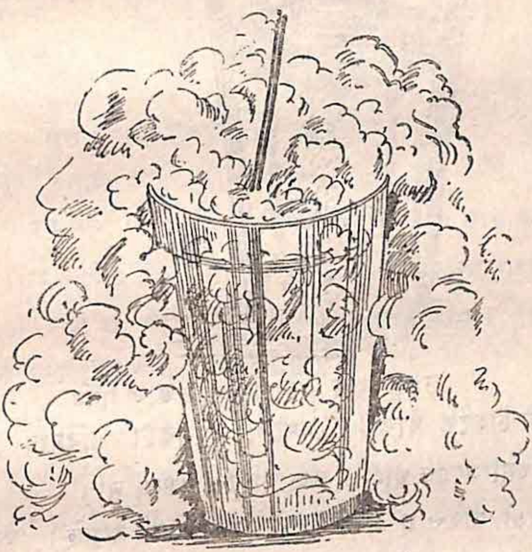
খেলার কথা বলছি। এই খেলাটাও বেশ কৌতুকজনক। সহজেই এটা তোমরা করে দেখতে পার।

এর জন্যে প্রথমে লম্বাটে ধরণের একটা U-অক্ষরের মত বাঁকানো চুম্বক যোগাড় করা দরকার। তারপর একটু পুরু সীসা বা পিতলের পাত্ থেকে টাকার আকারে একখানা গোল চাক্তি কেটে নাও। চাক্তিটার ঠিক মাঝখানে সরু একটা ছিদ্র করে মাপমত সরু এক টুকরো লোহার তার এফোঁড়-ওফোঁড় করে এঁটে বসিয়ে দাও। জিনিসটা চ্যাপ্টা একটা লাট্টুর মত হবে। হাত দিয়ে লাট্টুর মত ঘুরিয়ে দেখ, ঘোরবার সময় যেন টাল না খায়। এবার চাকটাকে ছবির মত করে খাড়াভাবে রাখা U-চুম্বকখানার উপরে ছেড়ে দাও। দেখবে, চাকাটা চুম্বকের বাহু দুটির উপর দিয়ে প্রান্তভাগের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাকাটা চুম্বকের প্রান্তভাগে এসেই থেমে যাবে না, গড়িয়ে চুম্বকটার উল্টো পিঠে, অর্থাৎ পিছন দিক দিয়ে অনেকটা উপরে উঠে যাবে। আবার সেদিক থেকে গড়িয়ে সামনের দিকে আসবে। এরূপ কিছুক্ষণ এধার-ওধার ওঠা-নামার পর অবশেষে প্রান্তভাগে এসে থেমে থাকবে। লক্ষ্য রাখবে, চাকাটা যেন অতিরিক্ত ভারী না হয়—চুম্বকের টানে সেটা যেন তার গায়ে লেগে থাকতে পারে।

কয়েকটি রাসায়নিক পরীক্ষা

পদার্থের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দুটি ধর্ম হচ্ছে—বিস্তৃতি আর অভেদ্যতা। পদার্থমাত্রেই কিছু না কিছু স্থান অধিকার করে থাকে—যাকে বলা হয় বিস্তৃতি এবং দুটি পদার্থ একই সময়ে একই স্থান অধিকার করে থাকতে পারে না—একে বলা হয়েছে অভেদ্যতা। এগুলি যে অতি সাধারণ জ্ঞানের কথা তা তোমরা সহজেই বুঝতে পার। ধর, একটা কাচের গ্লাসের গায়ে কাগজের সরু ফালি এঁটে দুধ বা জলের আয়তন অনুযায়ী আধ-পো, এক-পো ইত্যাদি দাগ কাটা আছে। প্রথমে গ্লাসের মধ্যে আধ-পো দাগ পর্যন্ত দুধ ঢাল। তার-

পর তাতে আবার সমপরিমাণ জল ঢেলে দিলে কি হবে? জল ও দুধ মিশ্রিত সেই তরল পদার্থের আয়তন গ্লাসের এক-পো দাগ অবধি বেড়ে যাবে—একথা সবাই বুঝতে পার। কিন্তু এমন কতকগুলি জিনিস নিয়ে এই রকমের পরীক্ষা করা যায়—যাতে সম আয়তনের দুটি বিভিন্ন তরল পদার্থ এক সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আয়তন বৃদ্ধি পায় না মোটেই—সমানই থেকে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ পরীক্ষায় আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া ত দূরের কথা বরং মিশ্রণের ফলে আয়তন কমে যায়।

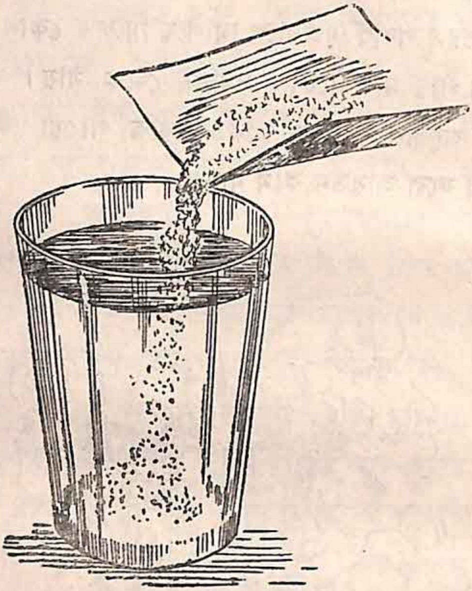


এক গ্লাস অ্যালকোহলের মধ্যে তূলা ভর্তি করা হচ্ছে

অ্যালকোহল দিয়ে একটা গ্লাস ভর্তি কর। তারপর একটা কাঠি দিয়ে খুব ধীরে ধীরে সেই অ্যালকোহলের মধ্যে আ-পেঁজা তূলা ডুবাতে থাক। খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ডুবাতে পারলে মাঝারি গোছের একঝুড়ি তূলা গ্লাসের মধ্যে অনায়াসে ডুবে যাবে, অথচ গ্লাসের অ্যালকোহল এক ফোঁটাও উপ্‌চে পড়বে না। ধীরে ধীরে ডুবানোর ফলে অ্যালকোহল তূলার তন্তুর মধ্যে ঢুকে যায়। এতে গ্লাসের

অ্যালকোহলের আয়তন সামান্য কিছু বৃদ্ধি পেলেও তা এতই কম যে, চোখে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

অন্যভাবেও আর একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। কানায় কানায় গরম জল ভর্তি একটা গ্লাসের মধ্যে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে

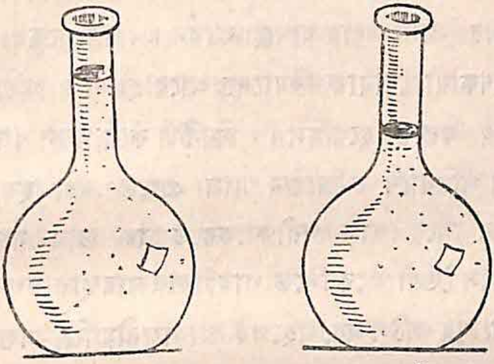


ঢালা হচ্ছে এক গ্লাস গরম জলে চিনি

মিহি চিনি ঢালতে থাক। দেখবে, অনেকটা পরিমাণ চিনি জলে মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও গ্লাসের জল উপ্‌চে পড়ছে না।

এ ছাড়া আরও দু-একটি পরীক্ষার কথা বলছি। অ্যালকোহল এবং জল অথবা জল এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে আরও অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাবে। অ্যালকোহল এবং জলের কথাই ধরা যাক। সমান আয়তনের জল এবং অ্যালকোহল যদি একত্রে মিশ্রিত করা যায় তবে দেখা যাবে, আলাদা আলাদা ভাবে এই তরল পদার্থ দুটির যতটা স্থান অধিকার করবার কথা—মিশ্রিত অবস্থায় তার চেয়ে অনেকটা কম স্থান অধিকার করবে। অর্থাৎ পৃথকভাবে এই দুটি পদার্থের আয়তনের যোগফল যদি হয় ১০০, তবে মিশ্রিত

অবস্থায় এর আয়তন হবে মাত্র ৯৪। সালফিউরিক অ্যাসিড ও জলের মিশ্রণের বেলায় আয়তন আরও কমে যাবে। খুব সহজেই পরীক্ষাটা করে দেখতে পার। সরু গলার দুটো কাচের ফ্লাস্ক যোগাড়



জল ও জলমিশ্রিত অ্যালকোহলের পরীক্ষা

করে একটার গলার প্রায় মাঝামাঝি অবধি জল ভর্তি করে সুতা বেঁধে চিহ্ন করে নাও। তারপর ঠিকমত মাপ করে তার অর্ধেক জল ঢেলে নিয়ে সেই জলের ঠিক সমান আয়তনের অ্যালকোহল তাতে ঢেলে দাও। জল ও অ্যালকোহল মিশ্রিত হয়ে যাবার পর দেখবে, মিশ্রণটি সেই সুতাবাঁধা দাগ পর্যন্ত পৌঁছায় নি।

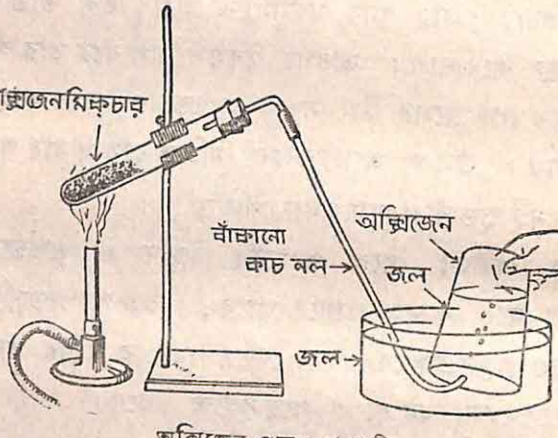
এসব পরীক্ষা থেকে পদার্থের বিস্তৃতি ও অভেদ্যতা সম্বন্ধে তোমাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে এসব ক্ষেত্রে পদার্থের ধর্মের ব্যত্যয় ঘটে না। তবে কেন এমন হয় তা পরে বুঝতে পারবে।

অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী

অক্সিজেন গ্যাসের কথা তোমাদের অজানা নয়। এর বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা না জানলেও একটা কথা বোধ হয় সবাই জান যে, অক্সিজেন ছাড়া আমরা শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারি না। যতই ঊর্ধ্বে ওঠা যায়, বাতাস ততই বিরল হতে থাকে;

কাজেই অক্সিজেনও কম পড়ে। এজন্যেই প্রথম এভারেস্ট অভিযাত্রী-দের ২৭,০০০ ফিট উপরে ওঠবার পর এক পা চলতে প্রায় ৭।৮ বার শ্বাসগ্রহণ করতে হয়েছিল। পরবর্তী অভিযাত্রীরা সে জন্যেই অক্সি-জেন সিলিণ্ডার সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করেন। গত যুদ্ধের সময় অতি উর্ধ্বে বিচরণকারী বোমারু বিমানের আরোহীদেরও অক্সিজেন সিলি-ণ্ডার ব্যবহার করতে হয়েছিল। ডিস্টিল করে তরল বায়ু থেকে অল্প খরচায় প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। তোমরা যদি অক্সিজেন নিয়ে কোন পরীক্ষা করতে চাও তবে সহজেই যাতে অক্সিজেন গ্যাস তৈরী করে নিতে পার, তার ব্যবস্থার কথা বলছি।

ব্যবস্থাটা খুব জটিল নয়, সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাড় করতে পারবে; তবে কোন ল্যাবরেটরীতে করতে পারলেই সবচেয়ে



অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী

সুবিধা হবে। যাহোক, প্রথমে একটা শক্ত কাচের টেস্ট টিউব যোগাড় করতে হবে। টেস্ট টিউবের মুখে বেশ এঁটে বসতে পারে, এই রকমের একটা কর্কের ছিপি এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করে তার মধ্যে ছবির মত দু-মুখ বাঁকানো লম্বা একটা কাচের নলের একটা মুখ ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার টেস্ট টিউবটার মধ্যে খানিকটা পটাসিয়াম ক্লোরেট রেখে নল সমেত কর্ক্‌টাকে টিউবের মুখে এঁটে

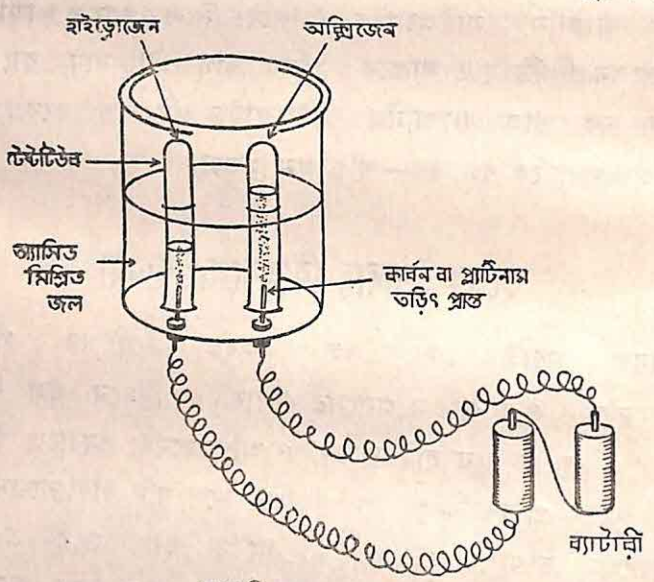
দাও। মুখটা উপরের দিকে রেখে কাৎভাবে টেস্ট টিউবটাকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আট্‌কে দিতে হবে। কানাউঁচু একটা পাত্রে জল ভর্তি কর। টেস্ট টিউবের বাঁকানো নলটার অপর মুখটাকে সেই জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। কানায় কানায় জল-ভর্তি একটা কাচের গ্লাস জলে-ডুবানো নলটার মুখের উপর উপুড় করে ধর। এবার গ্যাস বার্ণার দিয়ে টেস্ট টিউবের পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করলেই বুদ্‌বুদের আকারে গ্লাসের মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস উঠতে থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জলও কমতে থাকবে। পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে নিলে আরও তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নির্গত হতে থাকবে। তিন ভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশাতে হবে। এই মিশ্রিত পদার্থকে বলা হয়—অক্সিজেন মিক্‌চার।

জলের উপাদান বিশ্লেষণের ব্যবস্থা

তোমরা সবাই জান, জল একরকম যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমবায়ে উৎপন্ন, সে কথার প্রমাণ কি? জল বিশ্লিষ্ট হলে যদি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়া আর কিছু না পাওয়া যায়, তবেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই সহজে একটা পরীক্ষা করতে পার। এই পরীক্ষার সাহায্যেই দেখতে পাবে—জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কি ভাবে পরীক্ষাটা করতে হবে, তার ব্যবস্থার কথা বলছি।

বাজারে আজকাল সাদা প্লাস্টিকের নানারকম পাত্র কিনতে পাওয়া যায়। ওই রকম সাদা প্লাস্টিকের গ্লাসের মত একটা মাত্র

(পাত্রটি ছবির মত হলেই ভাল হয়) সংগ্রহ কর। পাত্রের তলায় দুটো মোটা ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্র দুটোর ভিতর দিয়ে দু-টুকরো মোম ছিপির মত করে বসিয়ে দাও। এবার টর্চের পুরনো ব্যাটারী ভেঙে ভিতর থেকে দুটো কার্বন-পেন্সিল সংগ্রহ কর। পেন্সিল দুটোকে মোমের ছিপির মধ্যে দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ঢুকিয়ে দাও। খানিকটা গরম একটা লোহার তার দিয়ে মোমটাকে নরম করে পেন্সিলের গায়ে এবং পাত্রের ছিদ্রের মধ্যে বেশ এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। এবার গ্লাসটাতে আধাআধি জল ভর্তি কর। দুটো টেস্ট



জল বিশ্লেষণের পরীক্ষা

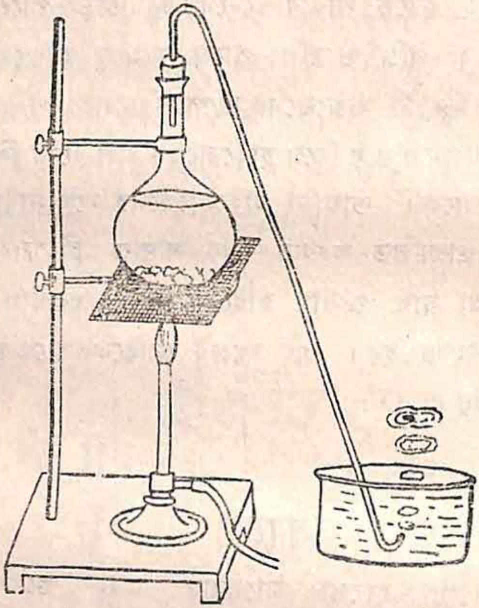
টিউব যোগাড় করতে হবে। টেস্ট টিউব দুটোতেই সম্পূর্ণরূপে জল ভর্তি করে হাতের বুড়ো আঙুলে মুখ টিপে উবুড় করে গ্লাসের জলের মধ্যে কার্বন-পেন্সিল দুটোর উপর বসিয়ে দাও। এবার টর্চ লাইটের দুটো ব্যাটারী সংগ্রহ করে তার সঙ্গে ছবির মত ব্যবস্থায় কার্বন-পেন্সিল দুটো যোগ করে দিলেই দেখবে—জলের মধ্যে দুটো কার্বন-পেন্সিল থেকেই গ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুদ্বুদ উঠে টেস্ট টিউবের

উপরে জমা হচ্ছে। আরও লক্ষ্য করে দেখো—নেগেটিভ তড়িৎ-প্রান্ত থেকে যে গ্যাস উঠছে সেটা পজিটিভ তড়িৎ-প্রান্ত থেকে উদ্ভূত গ্যাসের দ্বিগুণ। জলের মধ্যে দু-এক ফোঁটা অ্যাসিড অথবা সামান্য একটু নুন মিশিয়ে দিলে খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে—নেগেটিভ তড়িৎ-প্রান্তে জমেছে হাইড্রোজেন এবং পজিটিভ তড়িৎ-প্রান্তে জমেছে অক্সিজেন গ্যাস। শিখাশূন্য জ্বলন্ত খড়কুটা অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে। আর আগুন ধরিয়ে দিলে হাইড্রোজেন নীল বর্ণের শিখা বিস্তার করে জ্বলতে থাকে। তাছাড়া হাইড্রোজেনের সঙ্গে সামান্য বাতাস মিশ্রিত করে প্রজ্জ্বলিত করবার সময় সামান্য বিস্ফোরণ ঘটবে। এ থেকেই বুঝা যায়, দু-ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিলেই জল উৎপন্ন হয়। এই জন্যেই রসায়নের সাঙ্কেতিক ভাষায় জলকে লেখা হয় H_2O।

আলেয়া

তোমরা অনেকেই হয়তো আলেয়ার কথা শুনে থাকবে। রাত্রিবেলায় জনমানব-শূন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে অনেক সময় দেখা যায়—মাটি থেকে কয়েক হাত উঁচুতে একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে হঠাৎ যেন দপ্ করে নিবে গেল। প্রবল বৃষ্টিধারার মধ্যেও আগুনটাকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যায়। এই জিনিসটাকেই বলা হয় আলেয়া বা ভৌতিক আলো। আলেয়ার রহস্য সঠিক জানা না থাকলেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাওয়ায় ভেসে-বেড়ানো এক রকমের জ্বলন্ত অগ্নিগোলক সহজেই উৎপাদন করা যেতে পারে। তোমরা কেউ যদি আলেয়া প্রত্যক্ষ করতে চাও, তবে নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি করে দেখতে পার।

পরীক্ষাটা করতে হলে খানিকটা কস্টিক পটাস, কিছুটা ফস্‌ফোরাস, একটা কাচের ফ্লাস্ক, কর্ক্ ও লম্বা একটা কাচের নল যোগাড় করতে হবে। এসব জিনিস যে কোন কেমিস্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে।



ফস্‌ফোরেটেড হাইড্রোজেন বা আলেয়া উৎপাদন প্রণালী

প্রথমে কস্টিক পটাস জলে গুলে উগ্র সলিউসন তৈরী করে নিতে হবে। ফ্লাস্কের প্রায় অর্ধেকটা কস্টিক পটাস সলিউসনে ভর্তি কর এবং তার মধ্যে কয়েক টুকরো ফস্‌ফোরাস ফেলে দাও। কোল-গ্যাস অথবা হাইড্রোজেন দিয়ে ফ্লাস্কের উপরের অংশটার বাতাস তাড়িয়ে দিতে হবে। কাচের নলটা যাতে আঁটভাবে ঢুকতে পারে, কর্কের মধ্যে সে রকমের এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র কর। গ্যাসের বাতির উপর গরম করে কাচের নলটাকে ছবিতে দেখানো নক্সা অনুযায়ী বাঁকিয়ে নাও এবং বাঁকানো নলের সোজা দিকটা কর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে কর্ক্‌টাকে ফ্লাস্কের মুখে এঁটে দাও। ফ্লাস্কটাকে

স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে নলের অপর প্রান্ত জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। ছবিটা দেখে নাও। এবার গ্যাসের বাতির অল্প আঁচে ফ্লাস্কটাকে মিনিট কয়েক গরম করলেই দেখবে, জলের মধ্যে এক রকম গ্যাসের বুদ্বুদ উঠতে সুরু করেছে। জল থেকে বেরিয়ে এসেই গ্যাসটা কুণ্ডলীর আকারে হাওয়ায় ভেসে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠবে। এই গ্যাসটাকে বলা হয়—ফস্ফেন বা ফস্ফোরেটেড হাইড্রোজেন।

কস্টিক পটাস ও ফস্ফোরাস বিপজ্জনক পদার্থ, খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। ফস্ফোরাস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই ধোঁয়া বেরুতে থাকে এবং জ্বলে ওঠে; কাজেই ফস্ফোরাস সর্বদাই জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

ইলেকট্রোফোরাস

ইতিপূর্বে তোমাদের কিছু কিছু বৈদ্যুতিক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। এবার এমন একটা বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের কথা বলছি, যা সহজেই তোমরা তৈরী করতে পারবে। যন্ত্রটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোফোরাস। স্থির বিদ্যুৎ (Static electricity) উৎপাদনের জন্যে ১৭৫৫ খৃস্টাব্দে ভল্টা এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

ইলেকট্রোফোরাস তৈরী করতে হলে দুটি জিনিসের দরকার—রজন জাতীয় পদার্থের একটা পুরু চাক্তি, আর তড়িৎ-অপরিচালক কোন পদার্থের হাতলওয়ালা একখানা গোলাকার টিনের পাত্। নীচু কানাওয়ালা চওড়া একটা পাত্রের মধ্যে কিছু রজন (সিলিং ওয়াক্স হলেও চলবে) আগুনে গলিয়ে নাও। লক্ষ্য রাখবে, যেন বেশী গরম না হয়ে যায়; কারণ—তাহলে রজনে আগুন ধরে যেতে পারে। প্রথম দেওয়া রজন গলে গেলে তাতে টুকরো টুকরো করে আরও রজন দাও, যাতে পাত্রটা প্রায় কানায় কানায় ভর্তি হতে পারে। সবটা

গলে গেলে পাত্রটাকে আগুনের উপর থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও। পাত্রের মধ্যে রজন সমতল ভাবে জমে যাবে। এবার রজন জমানো গোলাকার পাত্রটার চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট করে পাতলা একখানা টিনের চাক্‌তি কেটে নাও। তামা, দস্তা ও প্রভৃতির পাত্‌লা

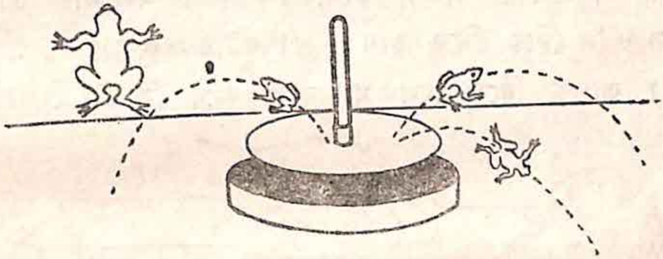


ইলেকট্রোফোরাস

চাক্‌তি হলেও চলবে। এবার টিনের চাক্‌তিটার ঠিক মধ্যস্থলে ছবির মত করে ছোট্ট একটা টিনের চোঙ্‌ রাং-ঝাল দিয়ে এঁটে দাও। এই চোঙ্‌টার মধ্যে ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা, মোটা একটা কাচের নল বসিয়ে সিলিং ওয়াক্স দিয়ে জুড়ে দিলেই তড়িৎ-অপরিচালক হাতলের কাজ হবে।

কি ভাবে ইলেকট্রোফোরাস ব্যবহার করতে হবে, এবার সে কথাই বলছি। শুক্‌নো এক টুকরো ফ্ল্যানেল বা পশমী কাপড় দিয়ে রজনের চাক্‌তিটাকে বারবার আঘাত কর, অথবা দ্রুতগতিতে কিছুক্ষণ ঘষে দাও। তারপর ডানহাতে কাচের হাতলটা ধরে টিনের চাক্‌তিখানা রজনের উপর রেখে বাঁ-হাতের আঙ্‌ুল দিয়ে মুহূর্তের জন্যে টিনের চাক্‌তিটাকে স্পর্শ কর। আঙ্‌ুল সরিয়ে নেবার পর কাচের হাতল ধরে টিনের চাক্‌তিটাকে রজনের উপর থেকে তুলে আন। দেখবে টিনের চাক্‌তিখানা বিশেষভাবে পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট হয়েছে এবং চাক্‌তির কিনারার কাছে হাত আনলেই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যাবে। চাক্‌তিটাকে আবার রজনের উপর রেখে

আঙুল দিয়ে স্পর্শ কর এবং পরক্ষণেই তুলে আন। দেখবে, পূর্বের মতই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। এইরূপে বার বার বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করা যায়; অবশ্য অনেকক্ষণ পর পর রজনের চাক্‌তিটাকে বেশ করে ঘষে দিতে হয়।



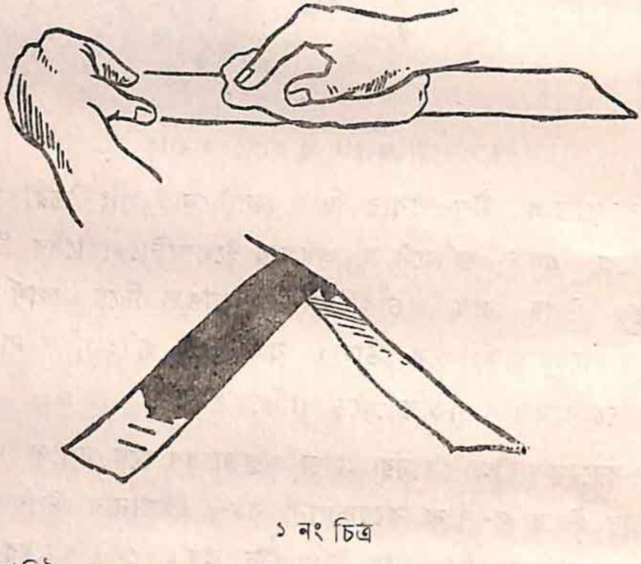
ইলেকট্রোফোরাস ও কাগজের ব্যাং

খুব পাত্‌লা টিস্যু-পেপার দিয়ে ছোট ছোট ব্যাং তৈরী কর। সেগুলিকে একটু স্যাঁৎসেঁতে অবস্থায় ইলেকট্রোফোরাসের টিনের চাকতির উপর রাখ। চাকতিটাকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ কর। তারপর কাচের হাতল ধরে তোল। যদি বেশী স্যাঁৎসেঁতে না হয়ে থাকে তবে ব্যাংগুলি চাকতি ছেড়ে লাফিয়ে পড়বে।

এ-ধরনের পরীক্ষা তোমরা অবশ্য অন্যভাবেও করে দেখতে পার। টেবিলের উপর দু-দিকে কয়েকখানা বই—একখানার উপর আর একখানা সাজিয়ে প্রায় চার ইঞ্চি উঁচু কর। সেই বইয়ের উপর একখানা কাচ রাখ। টিস্যু-পেপারের ছোট ছোট মানুষ, ব্যাং ইত্যাদি তৈরী করে কাচের নীচে রাখ। এক টুকরো রেশমী কাপড় দিয়ে অথবা খালি হাতেই কাচখানাকে আল্‌তোভাবে ঘষ্‌তে থাক। কিছুক্ষণ ঘষ্‌বার পরেই দেখবে, টিস্যু-পেপারের মূর্তিগুলি লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে। এই পরীক্ষা শুষ্ক আবহাওয়াতেই ভাল হয়।

তড়িতাবিষ্ট পদার্থের খেলা

১নং ছবির মত করে ২ ফুট লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া একখানি খবরের কাগজ কেটে নাও। কাগজের ফালিটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভাঁজ দিয়ে নিতে হবে। কাগজটার এক প্রান্ত চেপে ধরে পশমী কাপড় দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঘষে দিলেই সেটা ঋণ-

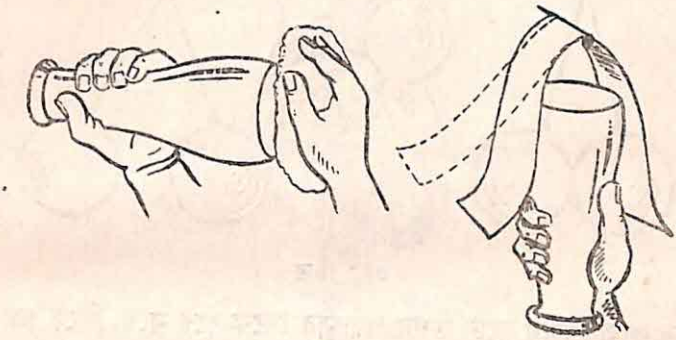


১ নং চিত্র

তড়িতাবিষ্ট হয়ে যাবে। এবার ফালিটাকে দু-ভাঁজ করে কোন কিছুর উপর ঝুলিয়ে দিলে দেখবে—ফালির দুটি বাহু দু-দিকে ছড়িয়ে যাবে, কিছুতেই একত্রিত হয়ে থাকবে না। কারণ, একই রকম তড়িতাবিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়।

আচ্ছা, এবার একটা কাচের বোতলকে রেশমী রুমাল দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘষে দাও। বোতলটা ধন-তড়িতাবিষ্ট হবে। তড়িতাবিষ্ট বোতলটাকে ঐ ছড়ানো কাগজের ফালিটার নীচে ধর। দেখবে, এবার আর ফালি দুটো ছড়িয়ে থাকবে না, বোতলের গায়ে এসে

লেগে যাবে। কারণ বিপরীত তড়িতাবিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ২নং চিত্র দেখ।



২নং চিত্র

একটা চিরুনীর পিঠের দিকটা পশমী কাপড় দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঘষে নাও। চিরুনীটা ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হবে। দু-ভাঁজ করা ঝুলানো কাগজের ফালির নীচে চিরুনীটা ধরলেই ফালির বাহু দুটো দু-দিকে ছড়িয়ে যাবে। ৩নং চিত্র দেখ।

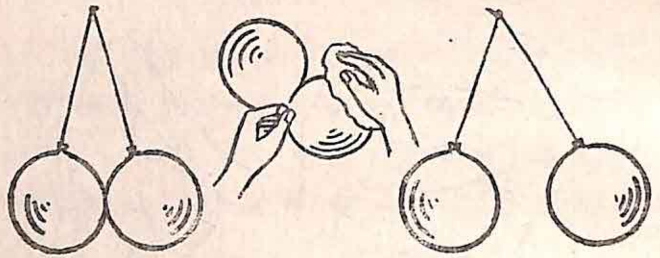


৩নং চিত্র

জলের কল অল্প করে খুলে দাও, যেন সরু নলে জল পড়তে থাকে। এবার পশম-ঘষা চিরুনীর পিঠের দিকটা জলের সরু নালের সমান্তরালে ধর। দেখবে, জলের ধারাটা চিরুনীর দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে বেঁকে যাচ্ছে।

রবারের দুটো বেলুন সুতায় বেঁধে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দাও। দুটোই

গায়ে গায়ে ঠেকে একসঙ্গে ঝুলে থাকবে। এবার বেলুন দুটোকে পশমী কাপড় দিয়ে ঘষে দাও। দেখবে, একই রকম তড়িতাবিষ্ট



৪নং চিত্র

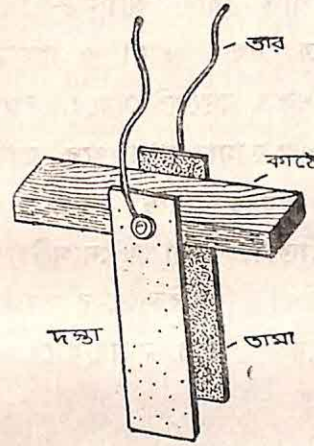
হওয়ার ফলে বেলুন দুটো তখন পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ঝুলছে। ৪নং চিত্র দেখ।

শীতকালের শুক্‌নো আবহাওয়াতেই এই পরীক্ষাগুলি খুব সুন্দরভাবে করতে পারবে।

বিদ্যুৎ-উৎপাদক সেল

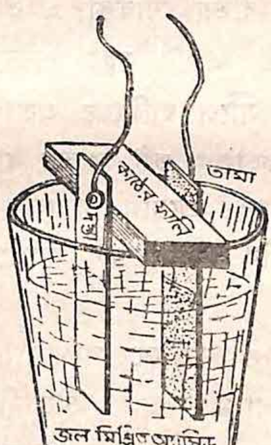
ছোটখাটো মোটর, বৈদ্যুতিক খেল্‌না, ইলেকট্রিক বেল প্রভৃতি চালাতে হলে ড্রাই-সেল কিনে কাজ চালাতে পার। নচেৎ সামান্য খরচায় তড়িৎ-উৎপাদক সেল তৈরী করে নেওয়া যায়। সহজ উপায়ে সেল তৈরী করতে হলে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া একখানা তামার পাত এবং একখানা দস্তার পাত যোগাড় করতে হবে। আর দরকার হবে জল-মেশানো খানিকটা সালফিউরিক অ্যাসিড। তামা ও দস্তার পাতের উপরের দিকে দুটো ছিদ্র করে নাও। স্ক্রু দিয়ে একখানা কাঠের গায়ে দু-দিকে পাত দুখানা এঁটে দাও। স্ক্রু দুটো এমনভাবে আঁটতে হবে যেন একটা আরেকটার সঙ্গে ঠেকে না যায়। কেমন করে আঁটতে হবে ১নং চিত্র দেখেই

বুঝতে পারবে। দুখানা পাতেই স্ক্রুর মাথার সঙ্গে দু-টুকরো সরু তার জুড়ে দিতে হবে।



১নং চিত্র

একটা কাচের গ্লাসের প্রায় গলা অবধি জল-মেশানো সালফিউ-রিক অ্যাসিডে ভর্তি কর। যতটা সালফিউরিক অ্যাসিড নেবে,



২নং চিত্র

তার প্রায় দশ গুণ জল মিশাতে হবে। একথা সর্বদা মনেঃ রাখবে,

ঠিকমত মিশ্রণ তৈরী করবার জন্যে জলের মধ্যে অল্প অল্প করে অ্যাসিড ঢালতে হবে।

এবার কাঠে আঁটা পাত দুখানা অ্যাসিড-ভর্তি গ্লাসের মধ্যে বসিয়ে দাও। ২নং চিত্র দেখ। তামা ও দস্তার পাতের সঙ্গে সংলগ্ন তার দুটির মুখ একত্র করলেই দেখবে, দস্তার পাত থেকে বুদ্বুদ উঠতে সুরু করেছে এবং তামার পাত থেকে তারের মধ্য দিয়ে দস্তার পাতে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তামার পাতটাকে বলা হয় পজিটিভ এবং দস্তার পাতটাকে বলা হয় নেগেটিভ পোল।

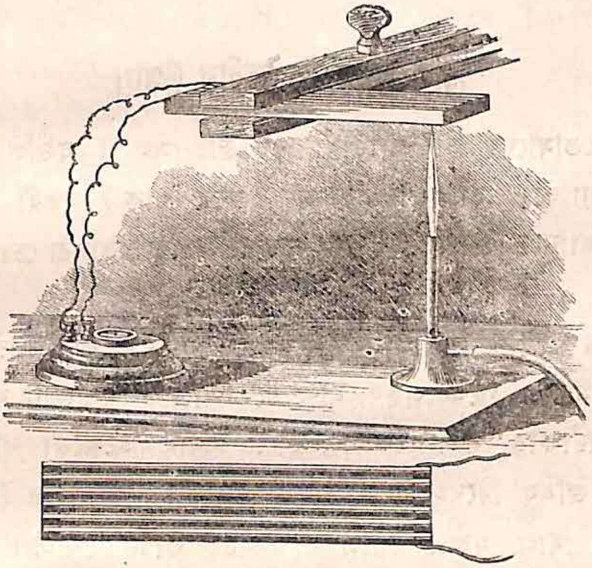
১৭৪৬ সালে প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভল্টা এই তড়িৎ-কোষ উদ্ভাবন করেন। তাঁর নামানুসারে একে ভল্টেইক সেল বলা হয়।

তাপ প্রয়োগে তড়িৎ উৎপাদন

তড়িৎ উৎপাদনের বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা তোমাদের পূর্বে বলা হয়েছে। এবার একটা সহজ ব্যবস্থায় তড়িৎ উৎপাদনের কথা বলছি। ১৮২১ সালে বার্লিনের অধ্যাপক সিবেক আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎ-পরিচালক দুটি বিভিন্ন ধাতুর দণ্ড একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে জোড়ামুখে তাপ প্রয়োগ করলে তড়িৎ-শক্তির উন্মেষ ঘটে। সাধারণ একটা পরীক্ষাতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

বিভিন্ন ধাতুর দুটি দণ্ড পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি জুড়ে যে জিনিসটা তৈরী হয়, তাকে বলে থার্মোপাইল। চিত্রে নীচের দিকে এই ধরনের একটি থার্মোপাইলের নমুনা দেখানো হয়েছে। এই থার্মোপাইলে আছে পিতল এবং জার্মান সিলভারের কয়েকটি দণ্ড—অভ্রের পাতা দিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক করে পরিবর্তীভাবে পাশাপাশি সাজানো অর্থাৎ

একটা পিতলের দণ্ডের পরে আছে অভ্রের পাত, আর তার পরেই আছে একটা জার্মান সিলভারের দণ্ড। এই দুটো দণ্ডের এক প্রান্তে রাং-ঝাল দিয়ে দুটোকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এইরূপে আরও কয়েক জোড়া দণ্ড পাশাপাশি রেখে পরিবর্তীভাবে পর পর জুড়ে দিলেই থার্মোপাইল তৈরী হবে। মোটের উপর, ভিন্ন ভিন্ন ধাতু



থার্মোপাইলে তাপ প্রয়োগে তড়িৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা।
নীচে থার্মোপাইল বড় করে দেখানো হয়েছে

একটার পর একটা জুড়ে জিনিষটা তৈরী করতে হবে। এবার থার্মো-পাইলের রাং-ঝালের বিপরীত প্রান্তে দু-দিকের দুটি দণ্ডের সঙ্গে সরু তার জুড়ে রাং-ঝাল দেওয়া প্রান্তে উত্তাপ প্রয়োগ করলেই তড়িৎ উৎপন্ন হবে। পাইলটি যদি অনেকগুলি দণ্ড মিলিয়ে তৈরী করা যায়, তবে তারের সঙ্গে ছোট্ট একটি পি-ল্যাম্প লাগালেই সেটা জ্বলে উঠবে। পাইলে দণ্ডের সংখ্যা কম থাকলে অন্যভাবেও তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা যায়। বাজারে খুব কম দামে কৌটায় বসানো একরকম চুম্বক-কম্পাস কিনতে পাওয়া যায়।

এই রকমের একটা কম্পাসের চারদিকে, থার্মোপাইলের সঙ্গে সংযুক্ত তারটাকে কয়েক ফেরতা জড়িয়ে নিয়ে তারের মুখ দুটো একত্র করলেই তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হওয়ার ফলে চুম্বক-শলাকার স্থান পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে।

ড্রাই ব্যাটারী তৈরীর উপায়

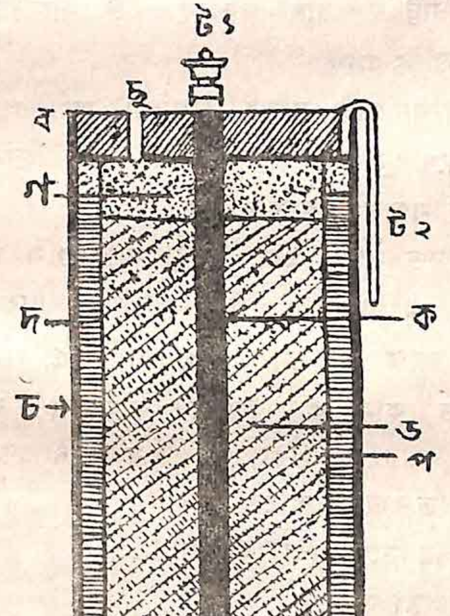
এবার তোমাদের ড্রাই-ব্যাটারী বা ড্রাই-সেল (যেগুলি তোমরা টর্চ ইত্যাদিতে হামেশাই ব্যবহার করে থাক) তৈরী করবার উপায় জানিয়ে দিচ্ছি। তৈরী করবার জন্যে তোমরা চেষ্টা করতে পার।

প্রথম চেষ্টাতে সব জিনিস কিনে এনে নিখুঁৎভাবে ব্যাটারী তৈরী করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। সে জন্যে বলছি—প্রথম পরীক্ষার সময় ফেলে-দেওয়া, অর্থাৎ অকেজো ব্যাটারীর অনেক জিনিষ দিয়েই কাজ চালাতে পার। ব্যাটারীর উপরকার কাগজের খোল, দস্তার খোল বা কৌটা, কার্বন পেন্সিল প্রভৃতি জিনিষগুলি পরিষ্কার করে নিলেই কাজ অনেক সহজ হবে। মোটের উপর, নিঃশেষিত ব্যাটারীর মশলাগুলি ফেলে দিয়ে নতুন মশলার সাহায্যে সেগুলিকে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে পারলেই সুবিধা।

এখন ব্যাটারীর কথা বলছি। ড্রাই-ব্যাটারী বা ড্রাই-সেল কথাটায় শুষ্ক তড়িৎ-কোষ বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক কোন তড়িৎ-কোষ থেকে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে পারে না। সাধারণ ব্যাটারীতে তরল ইলেকট্রোলাইট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণ ব্যাটারী যতই ছোট হোক না কেন, এই তরল পদার্থের জন্যে যে কোন অবস্থায় ইচ্ছামত ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যেই ড্রাই-ব্যাটারী উদ্ভাবিত হয়েছে। যে কোন অবস্থায় যেখানে-সেখানে ড্রাই-ব্যাটারী ব্যবহার করা যেতে পারে; উল্টে রাখলেও ভিতরকার জিনিষ গড়িয়ে পড়বার ভয় নেই। ড্রাই-ব্যাটারীতে যে মশলা ব্যবহৃত হয় সেটা তরল নয়, কাই-এর মত একটা নরম পদার্থ। এই কাই-এর মত নরম মশলাটা যাতে একেবারে শুকিয়ে না যায়, মশলার উপাদানে তারও ব্যবস্থা রয়েছে।

এখন চিত্রটাকে ভাল করে দেখে নাও। ব্যাটারীর ভিতর কি কি জিনিস, কোথায় কিভাবে বসাতে হবে, চিত্রে সেটা দেখানো



ড্রাই-ব্যাটারীর ভিতরকার অংশ দেখানো হয়েছে

হয়েছে। চ হচ্ছে কাগজের খোল, তার মধ্যে বসানো হয়েছে দ-চিহ্নিত দস্তার কৌটা বা খোল। দস্তার কৌটাটার উপরের মুখ খোলা আর নীচের মুখ বন্ধ। দস্তার খোলের তলার দিকে এঁটে

বসানো আছে ঘ-চিহ্নিত কার্ডবোর্ডের চাক্‌তি। কার্ডবোর্ডের চাক্‌তি তড়িৎ-অপরিচালক, অর্থাৎ ইনস্যুলেটরের কাজ করে। দস্তার কৌটার ভিতরের দিকের গায়ে প-চিহ্নিত স্থানে সাদা কাই-এর মত একটা জিনিষের আস্তরণ আছে। ড-চিহ্নিত জায়গায় ভর্তি করতে হবে কালো রঙের ডিপোলারাইজিং মশলা। এই মশলার মধ্যস্থলে বসানো থাকবে ক-চিহ্নিত কার্বন পেন্সিল। গ-চিহ্নিত স্থান করাতের গুঁড়া বা কার্ড-বোর্ডের চাক্‌তি দিয়ে আঁটা থাকবে; তার উপরে ব-চিহ্নিত স্থানে বিটুমেন গলিয়ে সিল করে দিতে হবে। সিলের ছ-চিহ্নিত স্থানে ভিতরকার গ্যাস বেরিয়ে যাবার জন্যে ছোট্ট ছিদ্র রাখা দরকার। $ট_১$ পজিটিভ তড়িৎপ্রান্ত; $ট_২$ নেগেটিভ তড়িৎ-প্রান্ত।

চিত্র দেখে ব্যবস্থাটা বুঝতে অসুবিধা হলে অকেজো একটা ব্যাটারী সন্তর্পণে খুলে দেখো—কোথায় কোন্ জিনিস কেমনভাবে বসানো হয়েছে, সহজেই বুঝতে পারবে।

কাই-এর মত সাদা এবং কালো মশলাগুলি কিভাবে তৈরী করতে হবে, এবার সে কথাই বলছি। ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপনীয়তার জন্যে ড্রাই-সেল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব মশলা তৈরীতে কোন্ কোন্ উপাদান কি অনুপাতে ব্যবহার করেন, তা জানবার উপায় না থাকলেও, তোমরা নিম্নোক্ত উপকরণগুলি লিখিত অনুপাতে ব্যবহার করতে পারো।

কালো রঙের ডিপোলারাইজিং মশলা :—

ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড	...	১০ পাউণ্ড
কার্বন অথবা গ্র্যাফাইট (অথবা দুটাই)	...	১০ পাউণ্ড
স্যাল-অ্যামোনিয়াক	...	২ পাউণ্ড
জিঙ্ক ক্লোরাইড	...	১ পাউণ্ড

সবগুলি পদার্থ একত্র করে প্রয়োজনমত জল দিয়ে নরম কাই-এর মত তৈরী করবে। জিঙ্ক ক্লোরাইড থাকবার ফলে মশলাটা কখনও

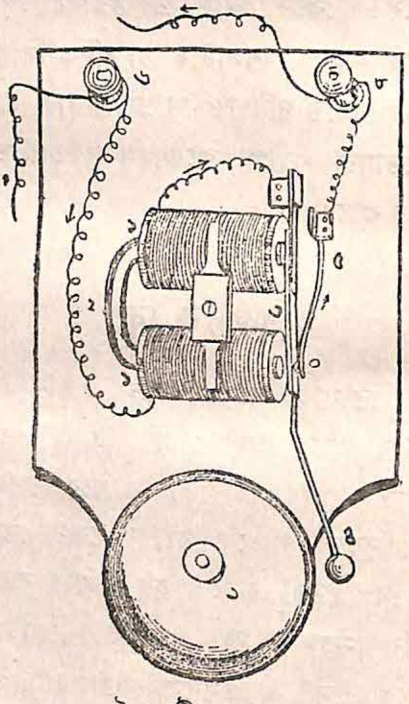
একেবারে শুকিয়ে যাবে না। মাপমত একটা চোঙ বা ছাঁচের মধ্যে কার্বন পেন্সিলটাকে ঠিক মধ্যস্থলে রেখে কালো মশলাটা বেশ এঁটে বসিয়ে দিবে। তারপর কার্বন সমেত মশলাটাকে ছাঁচ থেকে তুলে এনে দস্তার কৌটার মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে। তার চারধারে যে সামান্য ফাঁক থাকবে সেই ফাঁকের মধ্যে তারপর সাদা কাই-এর মত মশলা ঢেলে দিবে। রেখে দিলেই সেটা আস্তে আস্তে জমে বসে যাবে।

ময়দা, প্লাস্টার অব প্যারিসের সঙ্গে কিছুটা স্যালঅ্যামোনিয়াক এবং জিঙ্ক ক্লোরাইড মিশিয়ে প্রয়োজনমত জল দিয়ে সাদা কাই-টা তৈরী করতে হবে। কোন কোন প্রস্তুতকারক অবশ্য এই সাদা মশলাটার পরিবর্তে কালো মশলাটার চারিদিক ঘিরে একখণ্ড ব্লটিং পেপার মুড়ে দেন। এতে সুবিধাও আছে আবার একটু অসুবিধাও আছে। তবে তোমরা পরীক্ষা করে যে ব্যবস্থায় ভাল ফল পাওয়া যায়, তাই ব্যবহার করবে।

ইলেকট্রিক বেল

বাড়ীর ভিতরে তোমার ঘরে আছে একটা ইলেকট্রিক বেল, আর সদর দরজায় আছে সুইচের মত একটা বোতাম। সদর দরজায় এই বোতাম টিপ্‌লেই তোমার ঘরে ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠবে এবং তুমি বুঝতে পারবে, বাইরে কেউ তোমাকে ডাকছে। কেমন করে এই বেল তৈরী করতে হয় বুঝিয়ে বলছি। এই বেল তৈরী করা খুবই সহজ। মাত্র কয়েকটা ছোটখাট জিনিসের দরকার। সুতা জড়ানো বা এনামেল-করা হাত পঁচিশেক ২৮ নং তামার তার, সাইকেলের বেলের উপরকার একটি বাটি, U অক্ষরের মত বাঁকানো একটা নরম লোহার শিক (ইস্পাতের নয়), ঘড়ির কয়েক টুকরো ভাঙা স্প্রিং আর আধ ইঞ্চি পুরু, ৭৷৮ ইঞ্চি লম্বা, তিন

ইঞ্চি কি সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড কাঠ এবং কয়েকটা স্ক্রু যোগাড় করতে হবে। এবার ছবিটা ভাল করে দেখ। ছবির মত করে জিনিসগুলোকে যথাস্থানে বসাতে হবে। প্রথমে U অক্ষরের মত বাঁকানো ২নং লোহার শিকটার দু-দিকে ১,১ নম্বরের মত দুটো সুতার কাটিম বসাও। তারপর ২৮ নম্বরের তারটাকে দু-দিকে দুটো লম্বা মুখ রেখে কাটিম দুটোর গায়ে ছবির মত করে জড়িয়ে দাও। পঁচিশ হাত তারের অর্ধেকটা জড়াবে একটা কাটিমে, বাকী অর্ধেকটা জড়াবে অপর কাটিমে। প্রথম কাটিমটাতে ডান পাক দিলে দ্বিতীয়টাতে দিবে বাঁ-পাক। এবার U অক্ষরের মত লোহার গায়ে



ইলেকট্রিক বেল

তার জড়ানো সব জিনিসটাকে ছবির মত করে কাঠখানার উপর আটকে দাও। কাঠের উপর ৩ নম্বরের পাতের মত একটা স্প্রিং স্ক্রু দিয়ে বসাও। আর একটু উপরে ৫ নম্বরের মত একটা স্প্রিং এঁটে

দাও। এই স্প্রিঙের মাথাটা ৭ নম্বর স্থানে ৩ নম্বর পাতটার গায়ে লেগে থাকবে। ১,১ নম্বরের কাটিমের তারের একটা মুখ ৬ নম্বর স্ক্রুর সঙ্গে এবং অপর মুখটা ৩ নম্বর পাতটার সঙ্গে জুড়ে দাও। এবার ৫ নম্বরের স্প্রিঙের সঙ্গে একটু তার দিয়ে ৮ নং স্ক্রু যোগ করে দাও। ৩ নম্বরের পাতখানার সঙ্গে একটু তার ঝালাই করে ৪ নম্বর হাতুড়ি বসাতে হবে। ছোট্ট একটু কাঠের খুঁটির উপর ৯ নম্বরে সাইকেলের বেলের বাটিটা বসাও। এবার ১,১ নম্বর তারের দুটো মাথা ছোট্ট একটা ড্রাই-ব্যাটারীর (এগুলি সস্তা দরেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) দুটো মুখের সঙ্গে জুড়ে দিলেই বেলটা বেজে উঠবে। ৮ নম্বর এবং ৬ নম্বরের তার দুটোকে যতদূর প্রয়োজন বাড়িয়ে নিতে পার। এই দু-গাছা তারের যে কোন একটার সঙ্গে একটা স্প্রিঙের সুইচ বসিয়ে দিবে। সুইচের বোতাম টিপলেই ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকবে। ছেড়ে দিলেই বিদ্যুৎ চলবার রাস্তা কাটা পড়বে, আর ঘণ্টা বাজবে না।

কেমন করে ঘণ্টা বাজে, এবার সেকথা বলছি। সুইচের বোতামটা টিপ্‌লেই বিদ্যুৎ চলবার কাটা রাস্তা জুড়ে যায়। তখন ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ৬ নম্বরের তার দিয়ে বাঁকানো লোহার গায়ে কাটিমে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে ৩ নম্বরের পাতে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে ৭ নম্বরের সংযোগ-স্থল দিয়ে ৮ নম্বর তারের রাস্তায় পুনরায় ব্যাটারীতে ফিরে যায়। যতক্ষণ কাটিমের তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকে ততক্ষণই ওই বাঁকানো লোহাটা চুম্বকের গুণ লাভ করে ; বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লোহাটার চুম্বকের গুণও বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই কাটিমের তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকানো লোহাটা চুম্বক-শক্তিবলে ৩ নম্বরের লোহার পাতখানাকে নীচের দিকে টেনে আনে। এতেই বেলের উপর হাতুড়ির ঘা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ৭ নম্বরের সংযোগ-স্থলে ফাঁক হয়ে পড়ে। এই ফাঁক হওয়ার অর্থ—বিদ্যুৎ

চলবার পথ কেটে যাওয়া, অর্থাৎ বিত্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হওয়া। প্রবাহ বন্ধ হওয়ামাত্রই লোহার চুম্বকশক্তিও লোপ পায়, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ৩ নম্বর পাতখানাকেও ছেড়ে দেয়। ৩নং পাতখানা ছাড়া পেয়ে আবার ৭ নম্বরের সঙ্গে সংযোগসাধন করে। তৎক্ষণাৎ আবার বিত্যুৎ চলতে থাকে এবং ২নং চুম্বক, ৩ নম্বরের পাতখানাকে টেনে নিয়ে বিত্যুৎ চলবার পথ বিচ্ছিন্ন করে। এভাবে অনবরত ফাঁক ও সংযোগ হতে থাকে এবং ঘণ্টাও বাজতে থাকে।

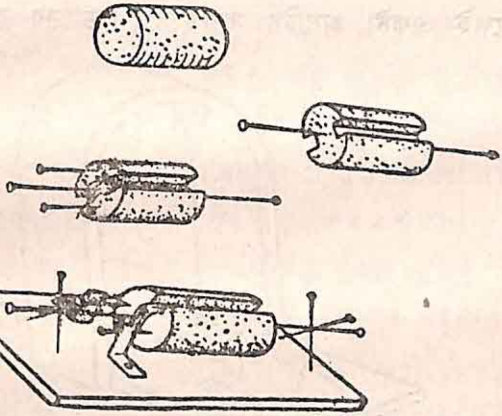
ইলেকট্রিক মোটর

ইলেকট্রিক মোটর জিনিসটা আজকাল কারো কাছে অপরিচিত নয়। তোমাদের কেউ যদি ইলেকট্রিক মোটর না-ও দেখে থাক, অন্ততঃ ইলেকট্রিক ফ্যান দেখেছ নিশ্চয়। যার সাহায্যে ফ্যান ঘোরে সেটাও এক রকমের ইলেকট্রিক মোটর। তড়িৎ-প্রবাহিত তারের তু-প্রান্ত সংযোগ করলেই মোটর ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ তড়িতের সাহায্যে কেমন করে মোটর ঘোরে, সেকথা পরে বুঝতে পারবে। অতি সহজ উপায়ে কেমন করে ইলেকট্রিক মোটর তৈরী করে দেখতে পার, সে কথাই তোমাদের বলছি।

এই রকম ইলেকট্রিক মোটর তৈরী করতে হলে খানিকটা কর্ক, আলপিন, চুলের কাঁটা, পাতলা টিনের পাত, ঘোড়ার নালের মত একটা চুম্বক-লোহা এবং খানিকটা ইনসুলেটেড সরু তামার তার যোগাড় করতে হবে।

প্রথমে ১নং চিত্রের উপরের দিকের নমুনার মত লম্বা অথচ গোল একখণ্ড কর্ক নাও। ধারালো ছুরি অথবা ক্ষুরের ব্লেড দিয়ে উপরের ডান দিকের ছবির মত করে কর্কটার তুদিকে লম্বালম্বি তুটো খাঁজ কেটে নাও। ঠিক মধ্যস্থলে—কর্কটার তুদিকে তুটো আলপিন বসাও। লম্বা একটা চুলের কাঁটা লম্বালম্বি এফোঁড়-ওফোঁড় করে বসালেও

চলবে। জিনিসটা দেখাবে অনেকটা ঘুড়ির লাটাইয়ের মত। মাঝের ছবিটার মত করে কর্কের এক প্রান্তে দুদিকে আরও দুটো আলপিন বসাও। এবার সরু ইনসুলেটেড তামার তারটাকে কর্কের খাঁজের মধ্যে ছবির মত করে কয়েক ফেরতা জড়িয়ে দাও। তারের প্রান্তভাগ ভাল করে চেঁচে নিয়ে কর্কের প্রান্তভাগের আলপিন দুটোর সঙ্গে চেপে জড়িয়ে দিতে হবে। তার-জড়ানো কর্কটাই হলো মোটরের আরমেচার।



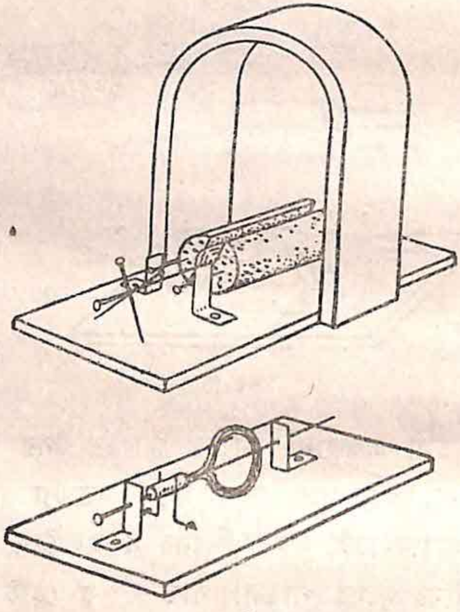
১নং চিত্র

এবার পাতলা একখানা কাঠের বোর্ডের উপর আরমেচারের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী দুটো করে আলপিন × চিহ্নের মত ট্যারচাভাবে বসিয়ে দিতে হবে। আরমেচারটাকে আলপিনের ×-এর উপর বসিয়ে দাও। সিগারেটের টিনের মুখের পাতলা পাত থেকে ছোট দুখানা সরু ফালি কেটে নাও। ফালি দুখানা L অক্ষরের মত বাঁকিয়ে নিয়ে সরু পেরেক ঠুকে কাঠখানার উপর এমনভাবে বসাও যেন কর্কের দু-পাশের আলপিন দুটোর গায়ে আল্‌তোভাবে লেগে থাকে। ১নং চিত্রের নীচের ছবিখানা দেখেই ব্যবস্থাটা ঠিকমত বুঝে নিতে পারবে।

২নং চিত্রের উপরের ছবিটার মত করে ঘোড়ার নালের মত একটা চুম্বক-লোহা আরমেচারের উপর দিয়ে বসিয়ে দাও। একটা

টর্চের ব্যাটারীর দু-প্রান্ত থেকে দুটো তার নিয়ে টিনের পাত দুটোর সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই আরমেচারটা ঘুরতে থাকবে। এ থেকেই ইলেকট্রিক মোটর ঘোরাবার কৌশলটা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারবে।

কর্ক না দিয়ে শুধু ইন্‌সুলেটেড তামার তার জড়িয়েও আরমেচার তৈরী করতে পার। ২নং চিত্রের নীচের ছবিটা দেখ। একটা পেন্সিলের উপর তামার তারটাকে উপর্যুপরি কয়েক ফেরতা জড়িয়ে খুলে নিলেই একটা আংটির মত হবে। তারের দু-প্রান্ত বাইরে



২নং চিত্র

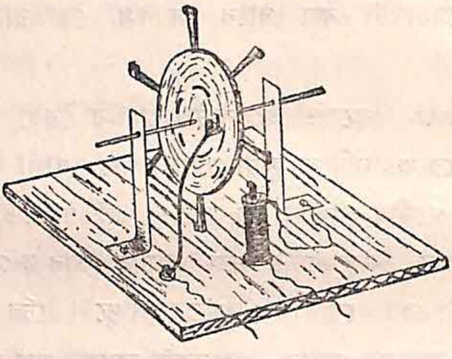
রেখে আংটির গায়ে সুতা জড়িয়ে বেশ করে বেঁধে নিলেই ভাল হয়। তারপর এর ভিতর দিয়ে লম্বা একটা চুলের কাঁটা চালিয়ে দাও। তারের প্রান্তভাগ দুটো যেদিকে আছে, সেদিকে চুলের কাঁটার গায়ে সরু এক ফালি কাগজ বেশ একটু পুরু করে জড়িয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। তার উপর তারের প্রান্ত দুটো পরস্পরের বিপরীত দিকে

রেখে সুতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। আলপিনের খুঁটির বদলে খুব পাতলা টিনের পাতে ফুটো করে আরমেচার ঘোরাবার ব্যবস্থা করতে পার। এর উপর চুম্বক-লোহা বসিয়ে পূর্বোক্ত ব্যবস্থায় টর্চের ব্যাটারীর সঙ্গে যোগ করে দিলেই আরমেচার ঘুরতে থাকবে। এই ব্যবস্থায় আরমেচারটা কেন ঘোরে, সে কথা তোমরা পরে জানতে পারবে।

এছাড়া অন্য রকমেও ইলেকট্রিক মোটর তৈরী করতে পার। একটা লম্বা পেরেকের দুদিকে ফুটো পয়সার মত দুখানা শক্ত কাগজের চাকতি বসিয়ে গাড়ীর চাকার মত কর। এই চাকতি দুটোর মধ্যে পেরেকটার উপর ইনসুলেটেড সরু তামার তার দু-ফেরতা জড়িয়ে তারের মুখ দুটো বের করে রাখ। তারের মুখ দুটো টর্চের ব্যাটারীর দু-প্রান্তে সংযোগ করলেই দেখবে—পেরেকটা চুম্বকের মত অন্য লোহার টুকরোকে টেনে ধরেছে। তারের মুখ ব্যাটারী থেকে সরিয়ে নিলেই পেরেকটার আর চৌম্বক শক্তি থাকবে না। এটাকে বলা হয়—ইলেকট্রোম্যাগনেট।

এবার পুরু কাগজ থেকে ৬ সেন্টিমিটার ডায়মেটারের তিনখানা গোল চাকতি কেটে নাও। একখানা চাকতির চারধারে সমান দূরত্বে খাড়াভাবে ৬টা খাঁজ কাট। এই খাঁজগুলির মধ্যে ৬টা চ্যাপ্টা কাটা পেরেক বসিয়ে চাকতিটার দু-পিঠে অপর চাকতি দুখানা আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। পেরেকগুলির মাথা চাকতি থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকবে। এবার দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে চাকতিটার মধ্যস্থলে একটা বৃত্ত এঁকে সেই লাইন ধরে সমান দূরত্বে ১২টা ছিদ্র কর। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ১৮ নম্বরের একগাছা খোলা তামার তার এফোঁড়-ওফোঁড় করে সেলাই করে দিলে চাকতির এক একদিকে ৬টা করে খোলা অংশ বেরিয়ে থাকবে। চাকতিটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা চুলের কাঁটা এদিক-ওদিক ফুঁড়ে দাও। সেলাই-করা তারের লম্বা মুখটা চুলের কাঁটার গায়ে জড়িয়ে

দিতে হবে। একখানা পাতলা কাঠের উপর টিনের পাতের খুঁটি এঁটে চাকতিখানাকে চাকার মত করে বসিয়ে দাও। সরু অথচ লম্বা একফালি টিনের পাত কাঠের উপর বসিয়ে উপরের দিকটা এমনভাবে বাঁকিয়ে দাও যাতে সেলাই-করা তারটার গায়ে আলতোভাবে চেপে



৩নং চিত্র

থাকে। এবার পেরেকের উপর তার জড়ানো ইলেকট্রোম্যাগনেট্টাকে কাঠখানার উপর এমনভাবে বসাও যেন চাকতিটা ঘোরালে ধারের পেরেকগুলি পর পর ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটের পেরেকটার খুব কাছে আসে অথচ তার গায়ে ঠেকে না। ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেট্টার তারের একপ্রান্ত টিনের পাতের খুঁটির সঙ্গে জুড়ে দাও। অপর প্রান্ত ব্যাটারীতে সংযোগ করতে হবে। ব্যাটারী থেকে আর একটা তার টিনের সরু বাঁকানো ফালিটার সঙ্গে জুড়ে দিলেই চাকতিখানা ঘুরতে থাকবে। ৩নং ছবিটা ভাল করে দেখে নিলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।

ইলেকট্রোপ্লেটিং

সচরাচর আমরা রূপার মত ঝক্‌ঝকে চায়ের চামচ ও অন্যান্য যে সব জিনিস ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি যে রূপার তৈরী নয়, একথা বোধহয় তোমাদের কারুরই অজানা নয়। কিছুকাল ব্যবহারের

পরেই দেখা যায়—ওসব জিনিসের রূপার মত ঝকঝকে আবরণটা উঠে গিয়ে পিতলের রং বেরিয়ে পড়েছে। পিতলের তৈরী জিনিসের উপর নিকেলের পাতলা একটা আস্তরণ দেওয়া থাকে বলে রূপারমত চকচকে দেখায়। ইলোকট্রোপ্লেটিং নামে এমরকম সহজ প্রক্রিয়ায় এই আস্তরণ দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটা এত সহজ যে, ইচ্ছা করলে তোমরাও অনায়াসে করে দেখতে পার। কেমন করে ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে হয়, সেকথা বলছি।

সোনা বা রূপার গিল্‌টি-করা* নানারকমের জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামা ও পিতলের তৈরী জিনিসপত্রের উপর গিল্‌টি করবার রেওয়াজ অনেককাল থেকেই প্রচলিত। পূর্বে আরও সহজ উপায়ে গিল্‌টি করা হতো। পারার সঙ্গে সোনা মিশিয়ে সে জিনিসটাকে তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্মিত জিনিসের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হতো। তারপর সেই জিনিসটাকে চুল্লীতে উত্তপ্ত করলেই পারা উবে গিয়ে সোনার সূক্ষ্ম আস্তরণ তার গায়ে লেগে থাকতো। রূপার আস্তরণ দেবার জন্যেও এই প্রক্রিয়ারই প্রচলন ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাটা যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনিই অস্বাস্থ্যকর। কাজেই ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ার পর এই প্রক্রিয়ার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়।

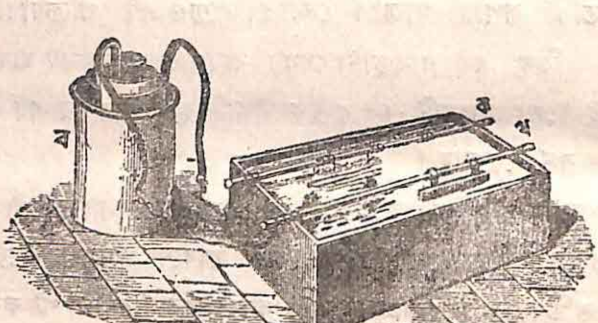
ব্রুগ্নেটেলি নামে ভল্টার জনৈক ছাত্র ১৮০৩ সালে পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে, সোনার ক্ষারধর্মী দ্রাবণের ভিতর দিয়ে ব্যাটারী থেকে তড়িৎ-স্রোত পরিচালন করে ধাতব পদার্থকে গিল্টি করা যেতে পারে। ডিলারাইভ-ই প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগান। তারপর ক্রমে ক্রমে এলকিংটন, রুয়োলজ এবং অন্যান্য আরও অনেকের প্রচেষ্টায় ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া বর্তমান সহজসাধ্য ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে।

*গিল্‌টি করা কথাটা যদিও সোনার গিল্‌টি অর্থেই ব্যবহৃত হয় তবু সব রকম ধাতুর আস্তরণ দেওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

ধর, তুমি একটা পিতলের আংটিকে সোনার গিল্টি করতে চাও। তোমাকে কি কি করতে হবে বলছি। প্রথমে তোমাকে একটা গ্লেজ-করা চিনামাটির বাটি বা ওই রকমের একটা কাচের পাত্র, গোটা তিনেক ব্যাটারী, খানিকটা পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং গোল্ড ক্লোরাইড যোগাড় করতে হবে। জিনিসগুলি কেমিস্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরী করে তাতে চীনামাটি বা কাচের পাত্রটাকে প্রায় ভর্তি করে দিতে হবে। ১ ভাগ গোল্ড ক্লোরাইড, ১০ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং ২০০ ভাগ জল— এই অনুপাতে মিশ্রণটি তৈরী করবে। কিন্তু সাবধান—পটাসিয়াম সায়েনাইড ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ—অসতর্কতার ফলে কোন রকমে মুখে বা জিভে লেগে গেলে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে।

এবার পাত্রটার উপর পরিষ্কার-করা দুটো সরু তামার রড বসিয়ে দাও। ১ নম্বরের ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য করলেই ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে।

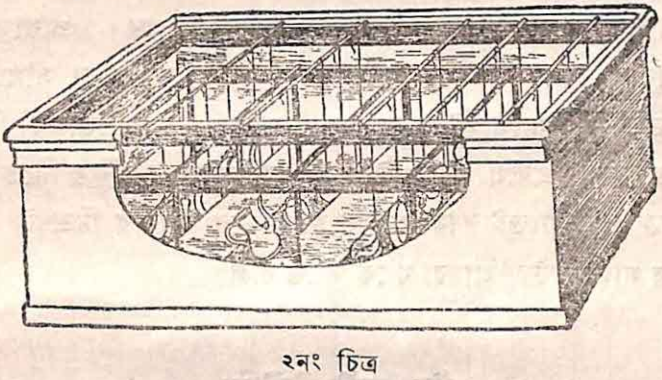


১নং চিত্র

কাচের পাত্রে মিশ্রণটা রয়েছে। পাত্রটার কানার উপরে ক ও খ চিহ্নিত দুটো তামার রড্ বসানো হয়েছে। ব-চিহ্নিত ব্যাটারী থেকে + চিহ্নিত পজিটিভ এবং – চিহ্নিত নেগেটিভ তার দুটোকে তামার রড্ দুটোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে 'বাথ' তৈরী

এবং ব্যাটারীর ব্যবস্থা করে নিয়ে আংটিটাকে খুব ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। প্রথমে আংটিটাকে গরম কর। গরম থাকতে থাকতে জল-মিশ্রিত হাল্‌কা নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে দাও। কিছুক্ষণ অ্যাসিডে থাকবার পর কড়া ব্রাস্ দিয়ে ঘষে পরিস্রুত জলে (ডিস্টিলড্ ওয়াটার) ধুইয়ে আগুনের আঁচে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নেবে। এরপর আবার সাধারণ নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়েই চট্ করে তুলে নেবে এবং নুন, ভুসাকালি ও নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত পদার্থে ডুবিয়ে দিবে। এখান থেকে তুলে আংটিটাকে বেশ করে পরিস্রুত জলে ধুইয়ে অল্প আঁচে ধীরে ধীরে শুকিয়ে নেবে।

এবার আংটিটাকে 'বাথে'র উপরে ব্যাটারীর নেগেটিভ তার সংলগ্ন রডের সঙ্গে সরু তারে ঝুলিয়ে মিশ্রণের মধ্যে



২নং চিত্র

ডুবিয়ে দাও। পজেটিভ তার সংলগ্ন রড্ থেকেও সরু তারে ঝুলিয়ে এক টুকরো সোনা মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সোনার যে কোন একটা জিনিস ঝুলিয়ে দিলেই চলবে। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রণ থেকে তুললেই দেখবে, আংটিটাকে আর পিতলের বলে চেনা যায় না— তার উপরে সোনার একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে গেছে। এই আস্তরণটাকে আরও পুরু করতে হলে আরও কিছু বেশী সময় ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর পরিষ্কার জলে খুব ভাল করে ধুইয়ে নিলেই হলো।

যেভাবে সোনার গিল্টি করা হয় ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই রূপা, তামা, নিকেল প্রভৃতির আস্তরণ দেওয়া হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। আংটিটাতে যদি রূপার আস্তরণ দিতে চাও তবে মিশ্রণটা হবে এরূপ ঃ—২ ভাগ সিলভার সায়েনাইড, ২ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং ২৫০ ভাগ জল। আংটিটাকে ঝুলাতে হবে নেগেটিভ রডটাতে, আর পজিটিভ রড্ থেকে ঝুলিতে দিতে হবে একখণ্ড রূপা। নিকেলের আস্তরণ দিতে হলে নিকেল অ্যামোনিয়াম সালফেটের 'বাথ' ব্যবহার করতে হবে। আর পজিটিভ রড্ থেকে মিশ্রণের মধ্য ঝুলিয়ে দিতে হবে একখণ্ড নিকেল।

যদি একসঙ্গে অনেকগুলি জিনিসকে গিল্টি করতে হয় তবে সেগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে রড্ থেকে ঝুলিয়ে দিতে হয়। ২ নম্বরের চিত্র দেখলেই ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে। প্রয়োজনমত ব্যাটারীর সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে হবে। ইস্পাত, লোহা, সীসা, টিন প্রভৃতির জিনিস গিল্টি করা অনেক শক্ত। এসব জিনিস গিল্টি করতে হলে প্রথমে এদের উপর তামার আস্তরণ ধরিয়ে নিতে হয়। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াতেই তামা ধরাতে হয় ; তবে 'বাথে'র মিশ্রণটা হবে কপার সালফেটের, আমরা যাকে তুঁতে বলি।

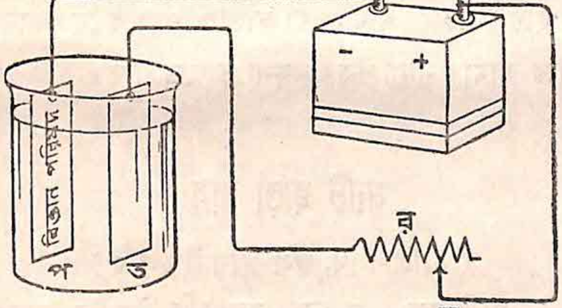
ইলেকট্রো-টাইপিং

ধর, পিতলের পাতের উপর তামার হরফে তোমার একটা নামের প্লেট তৈরী করতে চাও ; কিন্তু কেমন করে করবে ? খুব সহজ একটা ব্যবস্থার কথা বলছি। ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর কথা পূর্বেই তোমাদের বলেছি। সেই ব্যবস্থাতেই সামান্য একটু কায়দা করে পিতলের উপর তামার লেখা ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ইলেকট্রো-টাইপিং প্রক্রিয়া। ইলেকট্রো-টাইপিং প্রক্রিয়ায় পিতলের পাতের উপর তামার লেখা ফুটিয়ে তুলতে হলে বড় একটা কাচের

বীকার, ব্যাটারী, তামার পাত, পিতলের পাত, কিছু প্যারাফিন, তুঁতে-গোলা জল এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি জিনিস যোগাড় করতে হবে।

পিতলের যে পাতের উপর নাম লিখবে, প্রথমে সেটাকে ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। প্রথমে সেটাকে গরম কস্টিক সোডা সলিউসনে ডুবিয়ে কলের জলে ধুইয়ে নাও। তারপরে আবার হাল্কা সালফিউরিক এ্যাসিডে ডুবিয়ে কলের জলে ধুইয়ে নিতে হবে। কস্টিক সোডা ও সালফিউরিক অ্যাসিডে খুব সাবধানে ব্যবহার করবে যেন কোন রকমে গায়ে লেগে না যায়।

যার গায়ে নাম লিখবে সেই পিতলের পাতখানকে সাঁড়াশী দিয়ে ধরে গরম করে তার দু-পিঠে এবং ধারগুলিতে প্যারাফিনের একটা টুকরো বেশ ভাল করে বুলিয়ে দাও। ঠাণ্ডা হলেই দেখবে, পাতখানাতে প্যারাফিনের একটা পাতলা পর্দার আবরণ লেগে আছে। ছুরি বা নরুনের সরু মুখ দিয়ে প্যারাফিনের আস্তরণ কেটে কেটে তোমার নামটা লিখে দাও।



ইলেক্‌ট্রো-টাইপিং প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা

এবার কাচের বীকারের মধ্যে তুঁতে-গোলা জল ভর্তি কর। আঁকা পিতলের পাত এবং আর একখানা তামার পাতের প্রান্তভাগে ছিদ্র করে সেই ছিদ্রের সঙ্গে তার বেঁধে দাও। এই তারের সাহায্যে

ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে নাম-লেখা পিতলের পাত, আর পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে তামার পাত জুড়ে দিতে হবে। ছবিতে প-চিহ্নিত পিতলের পাত এবং ত-চিহ্নিত তামার পাত দেখ। তবে পজিটিভ প্রান্তে সংলগ্ন তারের সঙ্গে একটা রিওস্ট্যাট, অর্থাৎ খানিকটা রেজিস্ট্যান্স তার জুড়ে তার পরে তামার পাতটি সংযোগ করতে হবে। ছবির র-চিহ্নিত স্থানটা দেখ। ক-চিহ্নিত পজিটিভ তারের প্রান্ত রিওস্ট্যাটের বিভিন্ন জায়গায় সংলগ্ন করে ব্যাটারীর তড়িৎ-প্রবাহ ইচ্ছামত কম-বেশী করতে পারবে। এভাবে তারের সংযোগ করে পিতল ও তামার পাত দুখানা তুঁতে-গোলা জলের মধ্যে ছবির মত করে ডুবিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে, পিতলের পাতের নাম-লেখা দিকটা যেন তামার পাতের দিকে থাকে।

রিওস্ট্যাটের সাহায্যে খুব ক্ষীণ তড়িৎ-প্রবাহ চালাতে থাক। প্রায় আধ ঘণ্টা তড়িৎ-প্রবাহ চালাবার পর পিতলের পাতখানাকে তুলে এনে কলের নীচে ধুইয়ে তারপর গরম জলে ডুবিয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে পাতের গায়ের প্যারাফিন গলে ভেসে উঠবে। তখন দেখবে, পিতলের পাতের উপর কেমন সুন্দর তামার অক্ষরে তোমার নাম লেখা হয়ে গেছে। নাম লেখা ছাড়াও এভাবে যে কোন পিতলের পাতের গায়ে তামার নানা রকম নক্সা তুলতে পার।

মাটি ছাড়া চাষ

(বালি-চাষ, জল-চাষ ইত্যাদি)

এ-পর্যন্ত তোমাদিগকে খেলনা যন্ত্রপাতি তৈরীর কথা বলেছি। যাতে কার্যকরী কিছু একটা করতে পার, সে জন্যে এবার তোমাদিগকে চাষ-আবাদ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক দু-একটা কাজের কথা বলবো। তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছ, যারা নিজেদের ছোট্ট বাগানে বা বাড়ীর আনাচে-কানাচে অথবা টবের মধ্যে দু-চারটে ফল-মূল ও

ফুলের গাছ লাগিয়ে আনন্দ অনুভব করে। বিশেষ করে তাদের জন্যেই বালি-চাষ ও জল-চাষেরকথা আলোচনা করছি।

পরীক্ষার জন্যে মাটি থেকে একটা চারা গাছ তুলে নাও। ধর, পাঁচ-ছ' ইঞ্চি লম্বা একটা টোমাটোর চারা তুলে নিয়েছ। শিকড়ের গায়ে যেটুকু মাটি লেগে আছে সেটুকু জলে ধুইয়ে পরিষ্কার করে ফেল। এখন গাছটাকে এক জায়গায় ফেলে রাখলে কি হবে? গাছটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যাবে। কিন্তু এক জায়গায় ফেলে না রেখে পরিষ্কার বালির মধ্যে পুঁতে গাছটার শিকড়ের চারদিকে যদি জল দেওয়া যায় তবে কি হবে? নিশ্চয়ই গাছটা তখন পুনরায় সতেজ হয়ে উঠবে। কারণ, জীবনধারণের উপযোগী জল এবং খাড়া থাকবার জন্যে বালির অবলম্বন—অন্ততঃ এই দুটো জিনিসও সে পেয়েছে। কিন্তু দস্তুরমত বেড়ে ওঠবার জন্যে কেবলমাত্র এই দুটো জিনিসই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার খাদ্যেরও (রাসায়নিক পদার্থ) প্রয়োজন। কাজেই খাদ্য না পেলে শুধু জল আর বালির অবলম্বন তাকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

আচ্ছা, এবার বালির মধ্যে বসানো গাছটাকে যদি প্রয়োজনীয় আহার্য দেওয়া যায় তবে কি হবে? তখন দেখবে—যেন ম্যাজিকের মত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে। গাছটা বালির মধ্যেই তরতর করে বেড়ে উঠছে। মাটির মধ্যে সে যতটা বাড়তো হয়তো বা তার চেয়েও বেশী বেড়ে উঠবে এবং ফলও ধরবে প্রচুর। অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ব্যাপার ঘটে উঠবে না—বেশ কিছুদিন সময় লাগবে এবং মাটি ছাড়া-ই এই ব্যাপারটা সম্ভব হবে। কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা অবস্থা অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় ক্রমাগত জল ও রাসায়নিক আহার্য পদার্থের যোগান দিতে হবে। দেহ-পুষ্টির জন্যে গাছ মাটি থেকে কি অনুপাতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে, বিজ্ঞানীরা তা ভালরকমই জানেন। সে হিসাবে প্রথমে দিতে হয়—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফোরাস এবং পটাসিয়ামের রাসায়নিক মিশ্রণ।

তারপর ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, সালফার প্রভৃতি পদার্থগুলি দেওয়া দরকার। অবশ্য এমন জিনিসই ব্যাবহার করতে হবে, যেগুলি জলে গলে গিয়ে সেই অবস্থাতেই থাকে। সর্বশেষে অতি সামান্য মাত্রায় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, বোরোন, দস্তা প্রভৃতি দিতে হবে। কোন্ কোন্ পদার্থ কোন্ কোন্ মাত্রায় দিতে হবে নীচে তার একটা তালিকা দিলাম। এ থেকে তোমাদের সলিউসন তৈরী করে নিতে হবে। গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই রাসায়নিক পদার্থগুলির মিশ্রণকে আমরা নিউট্রিয়েণ্ট বা কালচার সলিউসন বলে উল্লেখ করবো।

পরীক্ষার জন্যে ভিজা বালি বা ভিজা ব্লটিং পেপারের মধ্যে টোমাটোর বীজ রেখে প্রথমে চারা গাছ উৎপাদন করতে পার। একটু বড় হয়ে উঠলে সেগুলিকে বালিভর্তি পাত্রের মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। এতে নিয়মিতভাবে নিউট্রিয়েণ্ট সলিউসন ঢেলে দিতে পার অথবা সলিউসনের পাত্রটাকে উঁচুতে রেখে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা করে অথবা ক্রমাগত প্রবাহিত করবার ব্যবস্থাও করতে পার। যাতে গাছটা লাগাবে সেই বালির পাত্রটাকে একখানা এনামেল করা থালা বা ট্রের উপর রাখলে ভাল হয়। কারণ বালির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে অনেকটা সলিউসন তলায় গিয়ে সেই ট্রের মধ্যে জমা হবে এবং সেটাকে বার বার ব্যবহার করতে পারবে। ৫।৬ দিন পর পর নিউট্রিয়েণ্ট সলিউসন ব্যবহার করা দরকার। বালি-চাষে গাছের শিকড়গুলি পাত্রের অনেকটা জায়গা জুড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বালির দানার ফাঁকে ফাঁকে যথেষ্ট বাতাসের সংস্পর্শেও আসতে পারে। কাজেই গাছগুলি যেমন আকারে বাড়ে তেমনি ফলপ্রসূ হয়। চাষের জন্যে মাঝারি দানার বালিই সুবিধাজনক। চালুনি দিয়ে ছেঁকে মাঝারি দানার বালি আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে। বালির দানা মোটা হলে তারা যথেষ্ট জল ও আহার্য পদার্থ ধরে রাখতে পারে না; আবার বেশী সূক্ষ্ম দানাগুলি শিকড়ের গায়ে কাদামাটির

মত নেপটে বসে যায়। ফলে শিকড় যথাযথভাবে বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

বালি-চাষে Quartz sand অর্থাৎ বালুকা-প্রস্তর থেকে উৎপন্ন বালি ব্যবহার করাই সঙ্গত। প্রথমে পরিমাণ মত বালি ছেঁকে নিয়ে সেগুলিকে ২০০° ফাঃ বা আরও বেশী উত্তাপে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গরম করে নেওয়া দরকার। ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করেও নেওয়া চলে।

জল-চাষের ব্যবস্থাও অনেকটা বালি-চাষের মত। তবে এই ব্যবস্থায় জলের পরিবর্তে খড়কুটা অথবা শুধু কালচার সলিউসনেই কাজ চলে। একটা পাত্রে কিছুটা নিউট্রিয়েন্ট বা কালচার সলিউসন রেখে সেটার উপর ছিদ্র-করা অথবা তারের জালের একটা ঢাক্‌না দিতে হয়। ঢাক্‌নার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তূলা অথবা কর্কের সাহায্যে গাছটাকে খাড়াভাবে রাখা দরকার। শিকড়গুলি কালচার সলিউসনের মধ্যে থাকবে। সলিউসনের মধ্য দিয়ে বুদ্বুদের আকারে শিকড়ের গায়ে বাতাস লাগবার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা গাছ সমেত ঢাক্‌নাটাকে মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে শিকড়ের গায়ে বাতাস লাগানো দরকার।

এই সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা না করে এবার একরকম কালচার সলিউসন তৈরীর কথা বলছি ঃ—

স্টক সলিউসন (ক)

আধ গ্যালন জলে এক চামচ বোরিক অ্যাসিড, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ও জিঙ্ক সালফেট একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন মত পরে এই সলিউসনে $\frac{১}{৮}$ চামচ কপার সালফেটও মিশাতে পার।

স্টক সলিউসন (খ)

এক পাঁইট জলে $\frac{১}{৪}$ চামচ আয়রণ (ফেরিক) ক্লোরাইড গুলে নিতে হবে।

কালচার সলিউসন

পরিমাণ	মনোপটাসিয়াম ফস্ফেট	ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট	অ্যামোনিয়াম সালফেট (শুষ্ক)
প্রতি ৫ গ্যালন সলিউসনে গ্রাম হিসাবে	৫·৯	২০·১	১০·৭	১·৮
প্রতি ৫ গ্যালন সলিউসন চামচ হিসাবে (মোটামুটি)	১¼	৪	২½	½

এর প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থ আলাদা আলাদা ভাবে প্রায় তিন পোয়া জলে গুলে নিতে হবে। রাসায়নিক পদার্থগুলি দ্রবীভূত হয়ে গেলে তাদের একত্রে মিশিয়ে ফেল। এই মিশ্রণে জল মিশিয়ে পাঁচ গ্যালন পর্যন্ত করতে হবে।

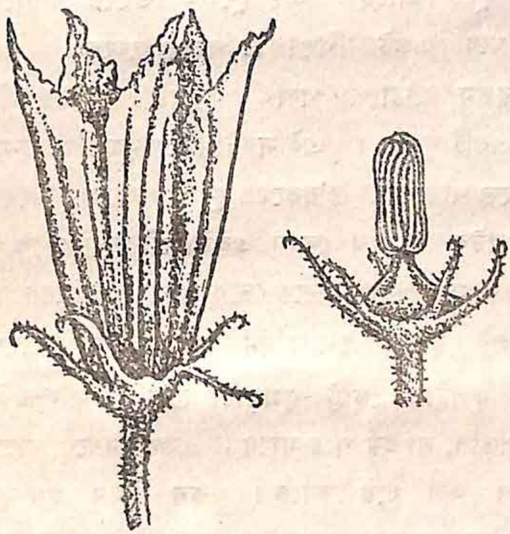
প্রতি গ্যালন কালচার সলিউসনে (বিশুদ্ধ রাসায়নিক থেকে প্রস্তুত হলে) ২ চামচ স্টক সলিউসন (ক) মিশিয়ে নাও।

যখন ব্যবহার করবে ঠিক সেই সময়ে স্টক সলিউসন (খ) কালচার সলিউসনের সঙ্গে মিশাতে হবে। এক গ্যালন কালচার সলিউসনে ৪ চামচ স্টক সলিউসন (খ) মিশিয়ে দিবে।

গাছে ইচ্ছামত ফল ধরানো

এবার তোমাদিগকে উদ্ভিদের বিষয়ে একটা পরীক্ষার কথা বলবো। গাছে ফুল ফোটে কেন বলতে পার? ফুল ফোটে ফল ধরবার জন্যে। কেমন করে ফল ধরে, সে কথা বলছি। প্রাণীদের মত উদ্ভিদের মধ্যেও স্ত্রী, পুরুষ ভেদ আছে। কতকগুলি উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ গাছ সম্পূর্ণ আলাদা। এদের কেবল স্ত্রী-গাছেই ফল ধরে। তাল পেঁপে প্রভৃতি গাছ এই রকমের। কতকগুলি

উদ্ভিদের স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য কেবল ফুলের মধ্যেই দেখা যায়। যেমন—লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি। আবার কতকগুলি গাছের একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে। যেমন আম, জাম, বেগুন ইত্যাদি। কোনটা স্ত্রী-ফুল আর কোনটাই বা পুরুষ-ফুল কেমন করে জানা যাবে? যে পদার্থটাকে ফুলের রেণু বলা হয়, তোমাদের প্রত্যেকেই বোধ হয় সেটা চেন। স্ত্রী এবং পুরুষ আলাদা ফুলের যেটার মধ্যে রেণু দেখবে, সেটাই হচ্ছে পুরুষ-ফুল। আর যেসব গাছে একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে তার যে অংশটুকুতে রেণু থাকে সেটুকু পুরুষ, আর



কুমড়ার পুরুষ-ফুল
ডানদিকে—ফুলের ভিতরের পুং-কেশর

যে অংশে শোঁয়ার মত জিনিস অথবা কোন আঠালো পদার্থ থাকে, সেটুকু হলো স্ত্রী অংশ। পুরুষ অংশের রেণু স্ত্রী অংশে লেগে গেলে গাছ ফলবতী হয়। নচেৎ প্রথমে ছোট্ট ফল দেখলেও পরে সেটা নষ্ট হয়ে যায় অথবা বোঁটা থেকে খসে পড়ে।

এবার পরীক্ষার কথা বলছি। পরীক্ষা করতে হলে সহজে চেনা যায়, এরকমের সহজলভ্য কোন বড় ফুলের গাছ নেওয়াই সুবিধা। কুমড়ার ফুলই প্রথম পরীক্ষার জন্যে বিশেষ উপযোগী। কিছুদূর লতিয়ে যাবার পর কুমড়া-লতার গাঁটে গাঁটে বড় বড় ফুল ফুটতে থাকে। কতকগুলি ফুলের বোঁটা খুবই লম্বা। সেই লম্বা বোঁটাওয়ালা ফুলের ভিতরে দেখবে—হল্‌দে রঙের স্থূলকায় অথচ লম্বাটে একটা পদার্থ। সেটার গায়ে আঙ্গুল লাগালেই আঙ্গুলের সঙ্গে হল্‌দে গুঁড়ার মত পদার্থ লেগে যাবে। সেগুলিই পুরুষ ফুলের রেণু। গাছটার আরও কয়েক গাঁট দূরে দেখবে—খুব ডগ্‌মগে অন্য রকমের ফুল ফুটে আছে। এই ফুলের ভিতরে লম্বাটে পদার্থের পরিবর্তে দেখবে, একটা পিণ্ডাকার পদার্থ রয়েছে। পিণ্ডটার গায়ে থাকে এক রকম আঠালো পদার্থ। ফুলটার বাইরে, নীচের দিকে থাকে ছোট্ট একটি কুমড়া। এই সবটা নিয়ে কুমড়ার স্ত্রী-ফুল। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। তু'রকমের ফুলই সকালের দিকে এক সঙ্গে ফোটে। ফোটবামাত্র যে কোন একটা স্ত্রী-ফুলকে খুব পাতলা টিস্থ কাগজ বা রেশমী রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখ। তুপুরের দিকে ঢাক্‌না সরিয়ে নিলেই হবে। তু-চারদিন লক্ষ্য রাখলেই দেখা যাবে—রুমাল-ঢাকা ফুলটার ছোট্ট কুমড়াটা ক্রমশঃ লাল্‌চে হয়ে বোঁটা থেকে খসে পড়বে, না হয় পচে যাবে। কিন্তু দেখবে, অন্যান্য ফুলের বোঁটায় বেশ ফল ধরে আছে। কেন এমন হয় বুঝেছ তো? মৌমাছিরা ওই ফুলের মধু খেতে এসে তাদের অজ্ঞাতসারেই পুরুষ-ফুলের রেণুগুলিকে স্ত্রী-ফুলের আঠালো পদার্থটার গায়ে লাগিয়ে দিয়ে যায়। তাতেই ফলটা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়ে বড় হয়ে ওঠে। রেণু না লাগলে স্ত্রী-ফুলটার সঙ্গে যে ছোট্ট ফলটা থাকে (চিত্র দেখ) সেটা বাড়তে পারে না। গাছে অজস্র ফুল ফুটলেও অনেক সময় মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা প্রভৃতি খারাপ আবহাওয়া এবং অন্যান্য কারণে স্ত্রী-ফুলে রেণু লাগা সম্ভব হয় না। কাজেই ফল ধরতে পারে না।

গাছ বাড়ন্ত এবং ফুলও অজস্র, এরূপ ক্ষেত্রে ফল ফলতে না দেখলে পাখীর পালক বা নরম তুলি দিয়ে রেণু তুলে এনে অথবা পুরুষ-ফুলের বোঁটা ছিঁড়ে নিয়ে স্ত্রী-ফুলের পিণ্ডকার পদার্থটার গায়ে রেণু লাগিয়ে দিলে দেখবে, প্রত্যেকটা ফুল থেকেই ফল বেড়ে উঠছে। খুব সাবধানে আল্‌তোভাবে রেণু লাগাতে হবে। কয়েকদিন চেষ্টা



কুমড়ার স্ত্রী-ফুল
ডানদিকে—ফুলের ভিতরের গর্ভ-কেশর

করলেই এই কাজে বেশ দক্ষতা লাভ করতে পারবে। ফসল বাড়ানো, উন্নত ধরনের ফসল উৎপাদন এবং আরও অনেক ব্যাপারে এর প্রয়োজনীয়তা অসাধারণ। যখন এই ব্যাপারে অন্ততঃ কিছুটাও সাফল্য লাভ করবে, তখন কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে উঠবে।